প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

ভূমিকা

সকল দেশের ও সকল কালের সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রধান বিষয় নরনারীর প্রেম। প্রেমই জগতের সমস্ত কাব্য-কলার প্রেরণা জুগিয়ে আস্‌ছে। সকল সাহিত্যে প্রেমের আবেগে যত কবিতা উৎসারিত হয়েছে তত আর কোনো বিষয় নিয়ে নয়। নর ও নারীর নিবিড় সম্মিলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রীতি, নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার এই নিয়েই যাবতীয় কবিতা। নরনারীর অনুরাগ, মিলনানন্দ আর বিরহ কবির কল্পনার রঙে রূপায়িত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে। তাই এযুগের কবি গেয়েছেন—

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নরনারীর প্রেম পবিত্র—শাশ্বত। একথা উপলব্ধি করে ইংলণ্ডের অমর কবি সেক্সপীয়ার প্রেমের জয়গান করে বলেছেন—

Love is an ever fixed mark,
That looks on tempests, and is never shaken ;
Love's not time fool, though rosy lips and cheeks
Within the bending sickle's compass come ;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom

ইংরেজি সাহিত্যের আর একজন কবিও ঠিক এমনিভাবে প্রেমের জয়গান করেছেন। ইনি হচ্ছেন Ella Wheeler Wilcox। ইনি বল্‌ছেন—

Life is too short for aught but high endeavour,—
Too short for spite, but long enough for love.
And love lives on for ever and for ever.

এই নরনারীর প্রেমকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে এত কবিতা রচিত হয়েছে যে তার পরিমাণ বড় সামান্য নয়। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কবি নর-নারীর প্রেমকে এমন বিচিত্র রূপে ও রঙে রূপায়িত করে প্রকাশ করেছেন যে তার ফলে আমাদের সাহিত্যের প্রেমের কবিতা-গুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ঝলমল করছে।

'বৌদ্ধগান ও দোহা' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু সেগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মসঙ্গীত। তাতে আমরা প্রেমের কথা পাই না। কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার পরেই বাংলা সাহিত্যের যে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন, এই বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত কতকগুলি খণ্ড-কবিতা বা পদাবলীও পাওয়া গিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর তাঁর পদাবলীতেই বাংলা গীতিকবিতার সুর প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। ইঁনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের কবি—প্রাক্‌চৈতন্যযুগে ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। বঙ্গদেশে চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত হবার বহু পূর্বে এঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আব পদাবলীতে আমরা সব প্রথম প্রেমের কবিতা পাই।

বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি। বিদ্যাপতিও প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি। কিন্তু বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিথিলার কবি। মিথিলার কবি হলেও বাঙ্গালী কোনদিন বিদ্যাপতিকে বাংলার কবিশ্রেণী হতে অপসারিত করতে পারবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলীর রসাস্বাদন করতে খুব ভালবাসতেন। ফলে বৈষ্ণব-ভাবে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী অতি প্রাচীনকালেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে

পড়েছিল। বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলী জড়িত হয়ে আছে। আমাদের দেশের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য—বিদ্যাপতির ভাব এবং কল্পনার দ্বারা আমাদের দেশের বহু কবি অনুপ্রাণিত। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রভাব খুবই সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলীর মাধুর্য বাংলা পদাবলীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে গিয়ে বাঙ্গালী পদকর্তারা এক নূতন লাবণ্যময়ী ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। সে ভাষার নাম ব্রজবুলি। এই ব্রজবুলিতে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী পদকর্তা পদরচনা করে খ্যাতিলাভ করে গিয়েছেন। বঙ্গের কবিদিগের উপরে বিদ্যাপতির প্রভাব খুব বেশী ছিল। বিদ্যাপতিব ভাব, কল্পনা, উপমা এবং অলঙ্কারের প্রভাব বহু বাংলা পদাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছে। বিদ্যাপতি ছিলেন বিরহ বর্ণনায় ও বিরহানন্তর মিলন-বর্ণনায় অতি সুনিপুণ শিল্পী-কবি। তাঁর উপমা-প্রয়োগও অপরূপ।

সংক্ষেপে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা করলাম। অতঃপর বড়ু চণ্ডীদাসের—অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালী কবির পদাবলীর আলোচনা আমরা করছি। বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যে ধরণের প্রেমবর্ণনা আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে পরচৈতন্যযুগের পদাবলী-সাহিত্যের প্রেমবর্ণনার পার্থক্য অনেক।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর বৈষ্ণব-পদালীতে—উভয় ক্ষেত্রেই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাই কবিদের বর্ণনার বিষয়। উভয় ক্ষেত্রেই দেখি, রাধাকৃষ্ণের বেনামী কবিগণ নরনারীর প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন—নরনারীর প্রেমের অনুভূতি এঁদের সকলকার কাব্যেই রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যে পদ্ধতিতে

বর্ণিত হয়েছে, পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা একেবারে অন্য পদ্ধতিতে বর্ণিত। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার পূর্ব্বরাগ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আছে। পরচৈতন্য যুগে যে-সকল পদাবলী রচিত হয়েছিল তাতে রাধিকার পূর্ব্বরাগই কবিরা বেশী দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন দেখা যায়। ঐ সকল পদে কৃষ্ণের সহিত মিলনলোলুপ বিহ্বলা রাধিকার মনোহারিণী মূর্তিটি বড় সরসসুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা প্রথম হতে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা নন। শ্রীকৃষ্ণই বারবার রাধিকার প্রতি তাঁর প্রণয়-নিবেদন করেছেন। পরচৈতন্য যুগের পদাবলীর নায়িকা রাধিকার কর্ণে শ্যামনাম যেন মধুবর্ষণ করে—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ির শত চেষ্টা সত্ত্বেও রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহার করে চলেছেন। পদাবলীর রাধিকার মত তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়ও বিভোর থাকেন না। পরচৈতন্যযুগেব পদাবলীতে পদকর্তাগণ যে রাধামূর্তি অঙ্কিত করেছেন সেই রাধা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর—তাঁর—

জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর।

তিনি বিজনে তমাল-তরুকে আলিঙ্গন দান করেন। মেঘের বর্ণ তাঁকে তাঁর প্রেমাস্পদের অঙ্গকান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। তমাল-তরুর ঘন-নীল নিবিড়তাও তাঁকে প্রিয়মিলনের জন্য ব্যাকুল করে তোলে, কারণ তমাল তরুর রং যে তাঁর প্রিয়তমেরই রং। ময়ুর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা দেখেও রাধিকার মনে পড়েছে শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যাম মূর্তিটি। রাধিকা জল আন্তে গিয়ে জলমধ্যে তাঁর প্রেমাস্পদের অঙ্গের নীলিমা দেখেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর মনের পটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি ঝলমল করতে থাকে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা বহুদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ এড়িয়ে চলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ দানছলে রাধিকার সঙ্গে হাটে সাক্ষাৎ

করেছেন। কিন্তু রাধিকা তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা অনুরক্তা হয়েছেন—তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনলোলুপ। তখন যমুনাতীরে বংশীধ্বনি হলে রাধিকা বিরহে কাতরা হয়ে ওঠেন—সেই বংশীধ্বনি নীরব হলে তাঁর অধীরতাব আর সীমা থাকে না। তিনি বলেন—

কে না বাঁশী বাএ বাডায়ি কালিনী নঈ কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বাডাযি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীব মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ৷ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বডাযি সে না কোন জনা।
দাসী হঞা তাব পদে নিশিবোঁ আপনা॥

যে রাধিকা পূর্বে বারংবার বলেছিলেন যে, 'কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ'—সেই রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনলোলুপা হয়ে এমনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন—

চাবিদিকে তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তেব বাএ।
আম্ব ডালে বসি কুযিলী কুহলে
লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো
চন্দন শরীব তাএ।
কাহ্ন বিণি মোব এবেঁ এক খন
এক কলি যুগ ভাএ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমনি বাঁশীর আহ্বানে রাধিকার ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বার কথা অনেক স্থানে আছে। প্রেমের আহ্বানে

এবং প্রেমকে মহিমান্বিত করবার জন্যই জগতের সকল সুর ও সৌন্দর্যের উদ্‌ভব। মুরলীরব সেই প্রেমেরই আহ্বান।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বিরহের কবি। তাই এই কাব্যে রাধিকার প্রেমের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে বিরহের মধ্য দিয়ে। বিরহিণী রাধিকার অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে, আর তাঁর আক্ষেপোক্তির ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেমের আবেগ আর গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে।

রাধিকার সেই বিরহ বসন্ত ও বর্ষাগমে খুব বেশী হয়েছে। বসন্ত এসেছে,—তার ফলে বনে বনে শিহরণ জেগেছে। আম্রকুঞ্জে মুকুল দেখা দিয়েছে। কোকিলের রব বন হতে বনান্তরে ধ্বনিত। এমনি সময়ে প্রেমিকা রাধিকার মনেও শিহরণ জেগেছে। কিন্তু প্রিয়মিলন না হওয়ায় সব তাঁর কাছে ব্যর্থ। কোকিলের রব তাঁর কাছে কুলিশের আঘাতের মত মনে হয়েছে।

মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধু লোভে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
ডালে বসি কুয়িলী কাঢে রাএ।
যেহ্ন কুলিশের ঘাএ॥

ঠিক এমনিভাবেই বিদ্যাপতি প্রেমিকার বিরহব্যথা বর্ণনা করেছেন।

সাহর মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥

বিরহ-বেদনায় ক্ষীণ কলেবরা হয়ে গিয়ে রাধিকা বলেছেন—

এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ॥

বিরহবিশীর্ণা বিদ্যাপতির রাধিকারও এমনি অবস্থা হয়েছিল—

কঙ্কণ বলয়া গলিত তুহুঁ হাথ।

মেঘদূতেও নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহিণী প্রিয়ার 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিরহিণী রাধিকার অভিমানিনী মূর্তিটিও বড় সুন্দর। তিনি অভিমানভরে বলেছেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
যদি কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিয়া মো খাইবোঁ গরলে॥

বিদ্যাপতির রাধিকাও এমনিভাবে বলেছেন—

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে॥

দিনের সূর্য এবং রাতের চন্দ্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহিণী রাধিকা কোনো পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন না।

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে
কেমনে সহিবো পরাণে বড়ায়ি
চখুতে নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদিনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥

বর্ষাগমে রাধিকার এই বিরহ বর্ধিত হয়েছে শতগুণে। কারণ বর্ষার সুরই বিরহের সুর। বর্ষাতেই প্রিয়মিলনের জন্য কালিদাসের কাব্যের বিরহী যক্ষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বর্ষাগমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহিণী রাধিকার অন্তরে অন্তরে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার আকুলতা জেগেছে সব চেয়ে বেশী। তিনি বার বার বলেছেন—

ফুটিল কদম ফুল ভবে নোয়াইল ডাল।
এভোঁ নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িয়া।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥

এবং—

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গবজএ
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুবএ ॥
পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ি যাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিবো রে বরিষা চারি মাস।
এ ভরা যৌবনে কাহ্ন করিল নিরাস ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত শুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুম-শর জ্বালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবে কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফাটি জায়িবে বুক ॥
আশ্বিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী ॥
তবে কাহ্ন বিণি হৈব বিফল জীবন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার মত বর্ষাবিরহে বিরহিণী বিদ্যাপতির রাধিকাও বলেছেন—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহকয় দাদুর মোর॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি।
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
সজনি, ছোড়লুঁ জীবন-আশা।
দারুণ বরিখা, জিউ ভেল অন্তর
নাহ রহল দূর দেশা॥
বাদব দরদর, নাহি দিন অবসর।
গবগব গবজই রাতি॥
অনিল অধীর, থিব নহে অন্তর।
দমকত দামিনী পাঁতি॥
ঘন ঘন ডাহুকী, ডহ ডহ ডাকই।
চাতক পিউ পিউ বোল॥
নাচত মত্ত শিখণ্ডক মণ্ডল।
নিশি দিশি দাদুরী-রোল॥
কোন কলাবতী কঠিন হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ॥

বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরেই উল্লেখ করতে হয় পদাবলী সাহিত্যের। প্রেমের কবিতা হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলী জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। এই পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বেনামী মানবপ্রেম শতদিকে শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। প্রেমের কবিতা হিসাবে পদাবলী সাহিত্য অদ্বিতীয়—ভাবে ভাষায় সেগুলি বিচিত্র। এই পদাবলী সাহিত্য বসন্তকালের অপর্যাপ্ত কুসুমের মত, যেমন সেগুলির ভাবের সৌরভ, তেমনি তাদের গঠনের পারিপাট্য। এই গীতিগুলিতে ভগবান্ ও ভক্তহৃদয়ের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে

মানবীয় প্রেমের সুরও মিশেছে। মানবীয় প্রেমের সুরের সঙ্গে ভগবানের ও ভক্তহৃদয়ের প্রণয়লীলার স্বর্গীয় সুরের এমনি এক মিলনে পদাবলী সাহিত্য অপূর্ব ও অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব সাধকেরা মনে করেন যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যটাই ভগবানের লীলা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা মানব-মানবীর প্রণয়লীলা নয়—এ মত তাঁরা পোষণ করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো কোনো পদে অবশ্য তত্ত্বের গন্ধ থাক্‌তে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও যে মর্ত্যবাসী নরনারীর তপ্ত প্রেমতৃষা ভাষা পেয়েছে একথাও সত্য। তাই এ যুগের কবি বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করেছেন—

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
> পূর্বরাগ অনুরাগ মান-অভিমান,
> অভিসার প্রেমলীলা বিরহ-মিলন, বৃন্দাবনগাথা
> এ কি শুধু দেবতার ? এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
> দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদেব প্রতি রজনীর আর
> প্রতি দিবসের তপ্ত তৃষা ?

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাস্তবিক এমন অনেক পদ আছে যাতে রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করে পার্থিব প্রেমই উৎসারিত হয়েছে। এমন অনেক পদ আছে, যেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত কবিরা করেন নি। সেই সব পদে সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপটি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়দর্পণ থেকে কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ সব পদে মর্ত্যবাসী প্রেমিকার বাহির ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য অপরূপ ভাষা পেয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই শ্রেণীর পদাবলীতে বেশ একটা Universal Appeal আছে। যেমন—

> যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই, তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই।
> যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ, তঁহি তঁহি বিজুরি-তরঙ্গ।

যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ, তঁহি তঁহি কমল পরকাশ।
যঁহা লহু হাস সঞ্চার, তঁহি তঁহি অমিয় বিথার।
যঁহা যঁহা কুটিল-কটাখ, তঁহি তঁহি মদন-শর লাখ।
হেরইতে সে ধনি থোর, অব তিন ভুবন অগোর।

—বিদ্যাপতি

এমনি কথা জগতের সকল দেশের ও সকল কালের প্রণয়ী তার প্রেমাস্পদকে দেখে বল্‌তে পারে। ঠিক এমনি কথা মিলটনের Paradise Lost-এ আছে।

Grace was in all her steps,
Heaven in her eye,
In every gesture dignity and love!

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে এমনিতর আর তুই একটি দৃষ্টান্ত। বিদ্যাপতি বল্‌ছেন—

গোধূলি পেখল বালা
যব মন্দির বাহর ভেলা,—
নব-জলধর বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলা॥
ধনি অলপবয়সি বালা,
জনি-গাঁথলি পুহপ-মালা,
থোরি দরশনে আশ না পূরল
রহল বিরহ-জ্বালা॥

গোরী কলেবর নূনা, জনু আঁচরে উজোর সোনা,
কেশরী জিনি মাঝ খীনি, তুলহ লোচন-কোণা।
ঈষত হাসনি সনে, মুঝে হানল নয়ন-বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে তরুণী ঘরের বার হলো, তখন সেই তন্বী ধনীর রূপে সন্ধ্যার অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুৎ-রেখার ভ্রম উৎপাদন করে গেল। সে রূপসী অল্পবয়সী বালিকা, সে যেন একগাছি গ্রথিত পুষ্পমালিকা। তাকে ক্ষণিক দর্শন

করে আশা মিটলো না—কেবল মদনের জ্বালাই রইলো। সেই ক্ষীণাঙ্গীর অঙ্গকান্তি গৌর, যেন অঞ্চলে উজ্জ্বল সোনা। কেশরীর চেয়েও ক্ষীণা তার কটিদেশ, দুর্লভ তার অপাঙ্গ দৃষ্টি। এমনি রূপবতী ঈষৎ হেসে আমার প্রতি নয়ন-বাণ হানলো।

সখিহে অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকর মদন-মিলিত মুখমণ্ডল
তা-পর জলধর মালা।
চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী মুচকাই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে-স্বপনে, আন না হেরি,
অনুখন সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

—রাধাবল্লভ

বৈষ্ণব-পদাবলী থেকে এই ধরণের সার্বজনীন আবেদন-মূলক কবিতা অসংখ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ ধরণের কবিতায় শ্রীকৃষ্ণ বা রাধিকার নাম পর্যন্ত নেই। এমনিধারা অনুভূতি বিশ্বের যে কোনো প্রেমিকের অন্তরে জাগতে পারে তার প্রিয়তমাকে দেখে। সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর এমনি ধরণের কবিতায় বিশ্বের সকল দেশের ও সকল কালের প্রণয়ীর অনুভূতি ভাষা পেয়েছে বলা যেতে পারে।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিকার প্রেম বহু অবস্থার মধ্যে বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সম্ভোগ এই সকল কবিতার প্রধান সুর বা শেষ কথা নয়। বরং এই শ্রেণীর গীতিকবিতা-গুলির মধ্যে প্রেমের অসীম দুঃখের যে গভীর সুর তাই ক্রমাগত ধ্বনিত হয়েছে। কারণ রাধিকার প্রেম Infinite Passion,—এ প্রেমের তৃপ্তি হতে পারে না। এ প্রেমে

মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুরটি বেজে উঠে প্রেমিক-প্রেমিকাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। যেমন—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥

অন্যত্র—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

—চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি-রচিত নিম্নলিখিত পদেও এই রকম Infinite passion বা প্রেমের অতৃপ্তি অভিব্যক্ত হয়েছে। বিদ্যাপতি বল্‌ছেন যে প্রিয়ের সহিত মিলন হওয়া সত্ত্বেও রাধিকার অন্তরে গভীর অতৃপ্তি আর বিচ্ছেদ-ব্যথা জেগে উঠেছে।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পীরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু,—
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ,—
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গমায়লুঁ,—
ন বুঝলুঁ কৈসন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ,—
তব হিয়া জুড়ন না গেলি॥

এমনি কথা জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসও বলেছেন—

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর,
সো অব কৈছন ভিন ভিন ঝুর॥—গোবিন্দদাস

কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয় নাম।—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব গীতিকবিতায় অনেক জায়গায় দেহজ সৌন্দর্যের কথাই নাই। বিদ্যাপতির এই সুবিখ্যাত পদটি এই শ্রেণীর প্রেমগীতিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল,
চরণ চপল গতি লোচন লেল।
অব সব খনে রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণ না পুছয়ে বাত॥
শুনইতে রস-কথা থাপই চিত—
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনয়ে সঙ্গীত॥
শৈশব-যৌবন উপজল বাদ।
কেও না মানয়ে জয় অবসাদ॥
অব ভেল যৌবন-বঙ্কিম দিঠ
উপজল লাজ, হাস ভেল মিঠ॥
খনে খনে দশন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চঙকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

এখানে রাধিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-সৌন্দর্যের কথা নেই। যৌবনস্পর্শে শ্রীরাধিকার মন যে নবীন ও চঞ্চল হয়েছে তা তাঁর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চরণের গতিতে আর সলজ্জ ভাবে ও হাস্যে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে শ্রীরাধিকা যেন কীট্‌সের—

Nymph of the downward smile and sidelong glance!

পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধিকার মত প্রেমিকা বিশ্বসাহিত্যে আর নেই। এঁর প্রেম প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ অবস্থার মধ্য

দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই রাধিকার অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে। একদিন ক্ষণিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখেছিলেন। তার পর হতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে তিনি তন্ময়। তাই প্রেমাস্পদকে দেখ্‌বার জন্যে, তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যে তাঁর অদম্য আকাঙ্ক্ষা—ক্ষণিক অদর্শনে অশান্ত তৃষ্ণা ও অপরিতৃপ্তি। বৈষ্ণব-কবিতার বৈশিষ্ট্যই এই। রাধিকার এমনি তন্ময়তা—তাঁর প্রেমের এমনি অবিচলিত একাগ্রতা। বৈষ্ণব-কাব্যে প্রেমের উন্মেষ, মিলন আর বিচ্ছেদ—এই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে যত রকমের ভাবেব উদয় হতে পারে তার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রেমবিহ্বলা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছেন। এই দর্শনের পর থেকে তিনি দণ্ডে শতবার ঘরেব বার হয়েছেন, তাঁর মন সর্বদাই উদ্বিগ্ন। ঘন ঘন কদম্ব-কানন পানে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তাঁর অঙ্গের বসন শিথিল হয়ে পড়ছে। কিন্তু তিনি তা সম্বরণ করতে ভুলে যাচ্ছেন। তাঁর কেশরাশি এলায়িত হয়ে পড়েছে, তাও তিনি সংযত কবছেন না। মাঝে মাঝে তিনি চমকে উঠছেন। তাঁর ভূষণ খসে পড়ছে।

আবার কখনও বা ইনি করতলে কপোল বিন্যস্ত করে মহাযোগিনীর মত কি ভাবছেন। লোকের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগছে না। বিরলে বসে অশ্রুপাত করছেন। নীল নিচোল ত্যাগ করে তিনি রাঙ্গা বাস পরিধান করেছেন। আহার ত্যাগ করেছেন। শরীব কৃশ হয়েছে। কখন মেঘপানে, কখন বা শ্যামকণ্ঠ ময়ূরের প্রতি, আবার কখনও বা বেণী এলায়িত করে আপনার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির প্রতি এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আবার কখনও সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ধরণীতে লুটিয়ে পড়েছেন।

শ্যাম-নামের মাধুরী চিন্তা করে রাধিকা বিহ্বলা। তিনি

ভাব্‌ছেন যাঁর নাম শুনে এমন আনন্দ, না জানি তাঁর সঙ্গে মিলনে কি অসীম আনন্দ। তাই তিনি বলেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈসে রয়॥

রাধিকা যে কৃষ্ণপ্রেমে মজেছেন তার গভীরতাই বা কত! দিবারাত্রি তিনি তাঁর দয়িতকে চিন্তা করেছেন। তাঁর প্রেমাস্পদের রূপের সঙ্গে যে কোনো বস্তুর সামান্য সাদৃশ্যও আছে তা দেখে তিনি বিমোহিত হয়েছেন। কালিন্দীর জল, কালো কেশ, নীল শাড়ী এ সবই তাঁকে আকুল করেছে। কৃষ্ণ তাঁর এত প্রিয় যে সদাই হারাই-হারাই মনে হচ্ছে। তাই তিনি তাঁর প্রেমের আকুতি প্রকাশ করেছেন এই বলে যে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

রাধিকা কৃষ্ণকে এক তিলের জন্য কাছ-ছাড়া করতে চান না। তাই বলেছেন—

সই, আমার অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়া।
বঁধুরে রাখিতাম আমি হিয়ার মাঝে লুকাইয়া॥

শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
নয়নে থুইতাম আমি জনমের মত।
অতসী কুসুম হইত শ্যাম।
আমার কালো কেশে লোটনে বাঁধিয়া রাখিতাম॥
সখি, চন্দন হইত শ্যামরায়।
মাখিয়া রাখিতাম আমি সকল গায়॥

রাধিকার অন্তরে প্রণয়সঞ্চার হয়েছে। তিনি অভিসারে যাবেন। তাঁকে কাঁটাপথে যেতে হবে, পিছলপথে যেতে হবে, অন্ধকারে যেতে হবে---তাই তিনি বাড়ীতে থেকেই সেই যাওয়া অভ্যাস করেছেন। কাঁটা পুঁতে তার উপর চল্‌ছেন, পাছে পায়ের নূপুর শব্দ করে, সেই জন্য কাপড়ে নূপুর বেঁধে নিঃশব্দে চলা অভ্যাস করেছেন, কলসী হতে জল ঢেলে পিছল পথে চলা অভ্যাস করেছেন। রাত্রি জাগরণ করে তিনি দুস্তর বা দূরতর পথ অতিক্রম করার সাধনা করেছেন। নিজের হাতের কঙ্কণ দিয়ে তিনি সাপের ওঝার কাছে সাপের মুখ বন্ধ করার ওষুধ আর মন্ত্র শিখছেন—যেন অভিসারের পথে সাপে তাঁকে দংশন না করে। গুরুজনের কথা তিনি কালার মত শোনেন—পরিজনের নিন্দা তিনি মুগ্ধার মত শুনে হাসেন। কারণ শ্যামের জন্য সকল দুঃখ সহাতেও তাঁহার যে অসীম সুখ। কবি গোবিন্দদাস অভিসারিণী শ্রীরাধিকার মিলনাকাঙ্ক্ষা বড় সুন্দর ভাবেই বর্ণনা করেছেন—

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি, ঢালি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

কর যুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগুধি সম হাস
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

প্রেমে যাঁর এত তন্ময়তা, যাঁর প্রেম এত মধুর, তাঁর এমনি গভীর আশা অপূর্ণ থাকে না। প্রেমাস্পদের সঙ্গে রাধিকার মিলন হলো। তখন—

দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে,
পুলকে পূবল দুহুঁ তনু॥

আবার—

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই, দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥

এমনি মিলনের পর একদিন অকস্মাৎ সংবাদ এলো যে রাধিকার প্রেমাস্পদ তাঁকে ছেড়ে মথুরায় যাবেন। রাধিকা কিন্তু এই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারলেন না—তিনি বললেন শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাওয়া অসম্ভব। তাঁকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ যেতে পারেন না। তাঁর হৃদয়ে যে শ্রীকৃষ্ণের আসন! তিনি

যে রাধিকার হৃদয়ে বাঁধা। কেমন করে কোন্ পথে তিনি যাবেন। তাই বল্‌ছেন—

আমারে ছাড়িয়া শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই ॥
তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥

কিন্তু হায়! বৃন্দাবন-বিলাসিনী সরলা রাধিকা যখন শুনলেন যে সত্যই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাবেন, তখন কৃষ্ণকে কত অনুনয় করলেন, অশ্রুপাত করলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। বিরহিণী রাধিকা তখন—

সোনার পুতলি অবনী উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়!

কারণ কৃষ্ণবিরহে তাঁর কাছে সবই শূন্য বলে প্রতিভাত হলো—

শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী।

যে রাধিকা কৃষ্ণের বিরহ ক্ষণমাত্রও সইতে পারতেন না—যাঁর সঙ্গে এতটুকু বিচ্ছেদ ঘটবার আশঙ্কায় রাধিকা তাঁর বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার পরতেন না, সেই প্রিয় আজ কত নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়েছেন,—একথা স্মরণ করে রাধিকা অত্যন্ত মর্মপীড়িতা হলেন। যিনি একদিন "হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে" তিনি আক্ষেপ করে বল্‌লেন—

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥

বিষম বিরহ-জ্বরে রাধিকার আঁখি ছলছল। শ্রীকৃষ্ণ কাল আস্‌বেন এই আশায় রাধিকা আছেন কিন্তু সে আশা তাঁর ব্যর্থ হলো।

কালি কালি করি' তেজল আশ।
কন্ত নিতান্ত—ন মিলল পাশ॥

এমনি সময়ে বর্ষা এলো—ভরা ভাদর—তখন,—

সখি হে, হমর দুখক নাহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ্‌ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোব॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি ববিথন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।
কুলিশ কত-শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুবী ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ— কৈসে গমায়ব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

সত্যই হরি বিনা দিন-রাত্রি কাটান রাধিকার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এমনি সময়ে তিনি চারিদিকে সুলক্ষণ দেখ্‌লেন। বুঝ্‌লেন যে আজ তাঁর প্রিয়ের আগমন হবে। একথা বুঝে রাধিকার মনে উল্লাসের সীমা নেই। তিনি সোল্লাসে বলে উঠ্‌লেন—

সখি, আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল॥

চিকুর ফুরিছে, বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥

বিরহিণী রাধিকার অন্তরে যখন এমনি আশার ক্ষীণ আলোক জেগে উঠেছে তখন সখী এসে খবর দিল যে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন—অমনি

চকিত নয়নে চাহিতে সঘনে
সমুখে দেখল পিয়া।

এইবার তাঁর সকল দুঃখ, সকল অভিমান দূরে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তিনি বললেন—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

প্রিয়কে নির্জনে পেয়ে তিনি বল্‌লেন—

বহুদিন পরে বধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥

চন্দ্রের কিরণ, বসন্তের বাতাস আর কোকিলের রব বিরহিণী রাধিকার অন্তরে এতদিন বড় দুঃখ দিয়েছিল। কিন্তু আজ প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের দিনে তিনি বলছেন—

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥

মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥

এইরূপে কথায়-কথায় ছন্দে-ছন্দে রাধিকার প্রিয়মিলনের আনন্দ ফুটে উঠেছে। প্রেম-সৌভাগ্যে শ্রীরাধিকার জীবন একটি নূতন পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে।

অতঃপর প্রথম মিলনের আবেগ শান্ত হলে রাধিকা বল্‌তে লাগ্‌লেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

জন্ম-জন্মান্তরে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করে ধন্যা হন এই তাঁর প্রার্থনা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমবর্ণনায় আর একটা জিনিস আছে—সেটা হচ্ছে রাধিকার অন্তর্জগতের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ। কাব্যে নায়িকার রূপবর্ণনা সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রচলিত রীতি। অন্যান্য কাব্যে দেখা যায় যে নায়িকার রূপ—তার আকর্ষণী শক্তির কথা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথবা তার দেহের দুই একটি প্রধান প্রধান অঙ্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি গিয়েছে রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দিকে—তারও অন্তরালে, বাহ্যিক রূপের অন্তরালে যে সরসসুন্দর প্রণয়-পাগল হৃদয় আছে, বৈষ্ণব কবিরা তারও সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের সাম্‌নে ধরেছেন।

একটা উদাহরণ দিই।—শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনো যুবতী-সন্দর্শনে গিয়েছেন এই ভেবে রাধিকার নিদারুণ অভিমান হয়েছে। তিনি তাই আক্ষেপ করে বল্‌ছেন—

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়।
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে ?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে।

এখানে দেখা যায় যে অভিমানিনী রাধিকা আর অভিশাপ খুঁজে পাননি। তিনি বলেছেন—আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে। এই যে সামান্য কথা—আমার পরাণ যেমতি করিছে—এর মধ্যে রাধিকার অন্তর্জগতের অবর্ণনীয় ক্লেশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ঐ একটি কথাতে বৈষ্ণব কবি রাধিকার অন্তর্জগতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়েছেন। রাধিকার সমস্ত হৃদয় ঐ একটি কথাতে আমরা দেখতে পেয়েছি—তাঁর বেদনার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়ে প্রেম যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেভাবে আর কোনো কাব্যের ভিতর দিয়ে হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতা ছাড়া নরনারীর প্রেম উৎসারিত হয়েছে—মঙ্গল-কাব্যে, ময়নামতীর গানে, আর ময়মনসিংহ গীতিকায়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে আমরা ব্যাধ কালকেতু এবং ফুল্লরার প্রেমের পরিচয় পাই। কালকেতু ব্যাধ অতিশয় দরিদ্র ছিল। তার সেই দারিদ্র্যের মধ্যে তার পত্নী ফুল্লরার

প্রেমের পরীক্ষা হয়েছে। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে বাণিজ্য উপলক্ষে সদাগরের অবর্তমানে খুল্লনার বিরহবর্ণনা কবি মুকুন্দরাম অতি সুন্দরভাবে করেছেন।

ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গান স্মরণাতীত কাল থেকে বঙ্গের পূর্ব-প্রান্ত থেকে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত গীত হতো। রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনী অবলম্বন করে যে গান রচিত হয়েছিল তাই 'রাজা মাণিকচন্দ্রর গান', 'ময়নামতীর গান' ও 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে পরিচিত হয়েছে। এই সব গানের রচয়িতা যে কে, তা স্থির করা যায় না। এই সব গান গ্রাম্য কবিদের রচনা। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতা—সর্বোপরি কবিত্ব—এ সবই পাওয়া যায়।

রাজা মাণিকচন্দ্র আর তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করলে গোপীচন্দ্রের দুই পত্নী তাঁদের স্বামী গোপীচন্দ্রের সঙ্গে যাবার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। আসন্ন বিয়োগব্যথায় ঐ দুটি তরুণী স্ত্রীর প্রেম ময়নামতীর গানে সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

এর পরেই ময়মনসিংহ গীতিকার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত কতকগুলি গাথা। এই গীতিকাগুলির মধ্যে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, দর্শন আছে, ধর্মতত্ত্ব আছে, সমাজ-তত্ত্ব আছে। কিন্তু এগুলির প্রধান মূল্য কবিত্বরসে—মানবমনের সুখদুঃখ, প্রেম-বিরহ-সম্বন্ধে প্রাণের দরদে। এগুলিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। এই গীতিকাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলার পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ-ধারা।

ময়মনসিংহ গীতিকার অনেকগুলি গাথাই গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। সত্যঘটনামূলক বলে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বাস্তব জীবনের প্রেমের স্বরূপ ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। জীবনের ট্রাজেডি এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতির সঙ্গে এই সব গাথায় বর্ণিত হয়েছে যে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক ছোট-গল্পের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। এই গীতিকাগুলির আর একটি বিশেষত্ব—এগুলি অভিজাত-সমাজের কাহিনী নয়, গ্রাম্য চাষী, দরিদ্র সামান্য লোকেদের প্রণয়বেদনার কাহিনী।

ময়মনসিংহ গীতিকার গাথাগুলিতে পূর্বরাগের কাহিনীই অধিক। যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হয়েছে, এই প্রেম পুরোহিত-শাসিত বা সমাজ-শাসিত প্রেম নয়। স্বচ্ছন্দ স্বাধীন হৃদয়ের আকর্ষণ। আর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে রমণী চরিত্রগুলিই ভাল ফুটেছে। রমণীর প্রেম সকল শাসন অগ্রাহ্য করে প্রিয়তমের দিকে প্রধাবিত হয়েছে। এর জন্য তাদের অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার বীরাঙ্গনারা—দুঃখের তপস্যায় জয়ী হয়েছে, প্রেমকে কখনও অপমানিত করেনি। সত্যই রমণীর প্রেমের যেমন সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশ ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এক বৈষ্ণব কাব্য ছাড়া প্রেমের বিকাশ এমন আর অন্য কোনো কাব্যে নেই।

ময়মনসিংহ গীতিকায় দুঃখের কষ্টিপাথরে নরনারীর—বিশেষতঃ রমণীর প্রেমের পরীক্ষা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই প্রেমের অবাধ শক্তি আর আনন্দের বন্যায় প্রেমপথের দুর্জয় বাধা-বিঘ্ন ভেসে গেছে। প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগবশত কত দুঃখ যে রমণী সহ্য করেছে তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকার "মলুয়া" শীর্ষক আখ্যায়িকা। এই আখ্যায়িকায় দেখি—চাঁদবিনোদ নামে এক যুবক কোড়াপাখী শিকার করতে

গিয়ে পুষ্করিণীর ধারে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। ঐ যুবককে দেখে মলুয়া সুন্দরী মুগ্ধ হয়।

ভিন্ দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।

অতঃপর কলসীতে—জল ভরার শব্দ করে মলুয়া চাঁদবিনোদকে জাগিয়ে তোলে। চাঁদবিনোদ জেগে উঠে—

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়॥
এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনার কাননে যেন মহুয়ার ফুল॥
ডাগল দীঘল আঁখি যার পানে সে চায়।
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায়॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি, চুরি করল মন॥
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশিব স্বপন।
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন॥
জলের না পদ্মফুল শুক্‌নার ফুটে রহিয়া।
আস্‌মানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥

যাহোক্—উভয়ের এই সাক্ষাতের পরে উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং উভয়ের বিবাহও হয়। কিন্তু এমনি বিধির নির্ব্বন্ধ যে—একদিন কাজী মলুয়াকে ঘাটে দেখে তাকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে চাঁদবিনোদ বন্দী হয়। কিন্তু মলুয়া দেওয়ানের নিকট নিজের পতিপ্রেম ও সতীত্বের পরিচয় দিয়ে নিজে মুক্তি পায় ও স্বামীকে মুক্ত করে আনে। কিন্তু গ্রামের লোকে মলুয়ার জাতি গিয়েছে বলে তাকে গৃহে স্থান দিতে চাঁদবিনোদকে নিষেধ করে। মলুয়া সমাজ-পীড়ন হতে স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে তাকে অন্য একটি বিবাহ দিয়ে নিজে তাদের দাসী হয়ে সেই বাড়ীর একান্তে বাস করতে থাকে। কিন্তু তাতেও

সমাজ-পতিরা সন্তুষ্ট না হয়ে চাঁদবিনোদকে পীড়ন করতে থাকে যে, সে মলুয়াকে গৃহে স্থান দিতে পারবে না। স্বামীর বিপদের সম্ভাবনা দেখে মলুয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে যাবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু স্বামীর নিকটে থেকে স্বামীসেবায় বঞ্চিত হয়ে থাকা মৃত্যুর অধিক ক্লেশকর বিবেচনা করে মলুয়া ভগ্ন নৌকায় উঠে চলে যেতে যেতে জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করে। প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য এইরূপ আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকায় অনেক আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার রমণিগণ ফুলের কুঁড়ির মত অনুরাগে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। অনুরক্তা কামিনী তার প্রেমাস্পদকে যে কথা বলেছে, অথবা কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে যে ভাবে প্রেম নিবেদন করেছে তা অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত।

বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে আর আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান, টপ্পা আর পাঁচালী গান রচিত হয়েছিল। এই যুগটিকে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকাল বলা হয়। এই যুগ হচ্ছে ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদের পরে আর মধুসূদনের পূর্বে। এই যুগসন্ধিকালেও গীতিকবিতা রচিত হয়েছিল, আর সেই গীতিকবিতার মধ্যে অধিকাংশেরই বিষয় প্রেম। কিন্তু এ যুগের প্রেম-গীতিকাগুলির মধ্যে একটা লঘুতা আছে যা এ যুগের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যুগের প্রেমগীতিতে লক্ষিত হয় না। এই সকল গীতির ভাষা ছন্দ ও রাগিণী যেন একটু কৃত্রিম। ছন্দ এবং নৈপুণ্যের যেন বেশ একটা অভাব। এই যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদের অনেক গানের ভাষায় এবং কল্পনাতে নৈপুণ্য আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব নাই। Fancy আছে, imagination নাই, wit আছে humour নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগের এক একটি গান এক একটি ভাবকে আশ্রয় করে গড়ে

উঠেছে, আর প্রত্যেকটির ভিতর একটি সহজ সম্পূর্ণতা আছে।

এই যুগসন্ধিকালের কবিদের মধ্যে সত্যিকারের কবিত্বের অভাব ছিল। কিন্তু সত্যিকারের লিরিক বল্‌তে যা বুঝায়, বাংলা সাহিত্যে তাঁরা তা দিয়ে গেছেন। সত্যিকারের লিরিক—গানের মত প্রাণের অন্তস্থল থেকে যা স্বতঃ-উৎসারিত—যা নিতান্ত মনের কথা,—একজনের উদ্দেশ্যে আর একজনের মনের কথা—এমনি লিরিক যুগসন্ধিকালের অনেক কবির আছে। ঐ সব কবিতা সাহিত্যজগতে বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু এগুলিই বাংলা প্রেমগীতিকাগুলিকে আধুনিকতায় দীক্ষিত করতে একদিন অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

কবিওয়ালা আর টপ্পাগান রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীধর কথক, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীধর কথক পাঁচালী গান এবং কবি গান—তুইই গাইতেন। তাঁর—"তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত" এবং "ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে" প্রভৃতি কবিতা উৎকৃষ্ট লিরিক—অর্থাৎ একান্ত নিজস্ব অনুভূতি এই সব কবিতায় পরিব্যক্ত। "ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে"—এই কবিতাটির সঙ্গে নিম্নলিখিত ইংরেজি কবিতাটি তুলনীয়—

Love me not for my comely grace,
For my pleasing eye or face,
Nor for any outward part,
No, nor for my constant heart,—
　　For those may fail, or turn too ill,
　　So thou and I shall sever:
Keep therefore a true woman's eye
And love me still but know not why
　　So hast thou the same reason still
　　To dote upon me ever.

রাম বসু অনেক কবির দলে গান বেঁধে দিতেন। তাঁর গানগুলি সরল ভাষায় প্রাণের কথা দিয়ে লেখা। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাম বসু সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।" রাম বসু বিরহ-বর্ণনায় ওস্তাদ কবি ছিলেন। তাঁর 'কোকিলের প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি বিরহের কবিতা। এর সঙ্গে রবার্ট বার্ণসের এই কবিতাটি তুলনীয়—

Thou'll break my heart, thou bonnie bird
　　That sings upon the bough ;
Thou minds me o' the happy days
　　When my fause Luve was true.
Thou'll break my heart, thou bonnie bird
　　That sings beside thy mate ;
For sae I sat, and sae I sang,
　　And wist na o' my fate.

কবিওয়ালা আর টপ্পা রচয়িতাদের মধ্যে রামনিধি গুপ্তের স্থান সর্বোচ্চে। ইনি নিধুবাবু নামে বাংলা দেশে পরিচিত। সাধারণ মানব-মানবীর মিলন-বিরহ, অনুরাগ-সোহাগ নিয়ে গান লিখে নিধুবাবু প্রকৃত গীতিকবিতা রচনার পথ প্রদর্শন করে যান। নিধুবাবুর টপ্পার সুরই তাঁর কবিতাবলীর প্রাণস্বরূপ। সুর ব্যতীত কেবল কথায় তাঁর কবিতাবলীর সৌন্দর্য সম্যক উপলব্ধি হয় না। তথাপি তাঁর রচনার মধ্যে কবিত্ব, মনস্তত্ব আর আন্তরিকতা এমন আছে, যাতে কেবল কথা পড়েও তাদের মূল্য যে কত তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। তাঁর 'পঞ্চশরের ভুল' চমৎকার কবিতা। গানটিতে হাসি (humour) এবং বেদনার (pathos) অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বাঙ্লা কাব্য-সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা’ আর ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্যে প্রেমের কবিতা আছে। এই সঙ্কলনে ব্রজাঙ্গনা আর বীরাঙ্গনা এই উভয় কাব্য থেকে প্রেমের কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনে খাঁটি love-lyric বলতে যা বোঝায় তা আমরা পাই না। খাঁটি love-lyric অত্যন্ত স্পষ্ট সহজ উক্তি—একেবারে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ খাঁটি love-lyric-এ ব্যক্ত হয়ে থাকে। মধুসূদনের ঠিক সে ধরণের love-lyric নেই। কারণ তাঁর ব্রজাঙ্গনায় রাধাকৃষ্ণের বেনামী প্রেম উৎসারিত হয়েছে—বীরাঙ্গনায় বিশেষ বিশেষ নায়ক-নায়িকা তাঁদের প্রণয়িনী বা প্রেমিকের কাছে তাঁদের প্রেম নিবেদন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম একান্ত ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ—একান্ত নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল বিহারীলালে। বিহারীলাল নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা কবিতায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। বিহারীলালের প্রেমের কবিতায় এমন একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি ফুটে উঠেছে যা সার্বজনীন। এই রকম সার্বজনীন আবেদন অনেক বৈষ্ণব-কবিতায়ও ছিল। কিন্তু এরূপ সার্বজনীন আবেদনমূলক প্রেমের কবিতা আধুনিক যুগেই সব চেয়ে বেশী রচিত হয়েছে—এবং তার প্রথম উন্মেষ বিহারীলালে।

আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার বিশেষত্ব ও অনির্বচনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী কবি—তাঁর মন অতিরিক্ত রকম আধ্যাত্মিক। তাই তাঁর কাব্যে নরনারীর প্রেমকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই idealise করেছেন, তাঁর কাব্যে নরনারীর প্রেম একেবারে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)। সংযম রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য—সংযতশ্রী রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলির অপরূপত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে

রচিত প্রেমের কবিতায় যেন একটু লজ্জা, কুণ্ঠা, ভীরুতা, সংশয় আছে। 'মানসী'র যুগ পর্যন্ত এই সংশয়, কুণ্ঠা, লজ্জা ভীরুতা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 'বর্ষার দিনে' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে কুণ্ঠিত সংশয়াকুল প্রেমিক লজ্জায় তার অন্তরের গূঢ়তম কথাটি তার প্রেমিকাকে সব সময়ে বলতে পারে না—একবার মাত্র বিশেষ একটা দিন-ক্ষণ পেলে তবে তা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের কবিতা উপন্যাসের এক জায়গায় বলেছেন—"বৃষ্টির দিনে, যাকে ভালবাসি তার দুই হাত চেপে ধরে বলতে ইচ্ছে করে—জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ এই কথাটি বলা সহজ।" এই অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে 'বর্ষার দিনে' কবিতায়। বিশেষ দিন-ক্ষণে প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে প্রেম নিবেদন করতে সক্ষম। প্রণয়-নিবেদনের লগ্নটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে "তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় মনে আসবে, তখন তাণ্ডব-নৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে।"—শেষের কবিতা।

ক্ষণিকার যুগে রবীন্দ্রনাথ রূপক ছেড়ে—ভীরুতা সঙ্কোচ লজ্জা সংশয় ছেড়ে সোজা কথায়, স্পষ্ট ভাষায় নেমে এসেছেন। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'সোজাসুজি' শীর্ষক কবিতাটি। সোজা-সুজি কবিতার উক্তি অনেকটা স্পষ্ট—অনেকটা ব্যক্তিগত।

পূরবী মহুয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পূর্ণ পরিণত—যৌবনের উদ্দামতা আর ঐশ্বর্য্য এই দুই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই যুগে—বিশেষত মহুয়ার যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এমন একটা বিশেষত্ব—এমন একটা অভিনবত্ব আর অনির্বচনীয়তা ফুটে উঠেছে যা অপূর্ব। মহুয়ায় উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা অসংখ্য। এই কাব্যের প্রেমের কবিতায় একটি নূতন সুর উত্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা তার কমনীয়তা,

স্নিগ্ধ নম্রতা ছেড়ে এই যুগে বীরের প্রেমরূপে উৎসারিত হয়েছে —মহুয়ার প্রেমের কবিতা শৌর্য্যের দ্বারা মহিমান্বিত। মহুয়ায় প্রণয়ের একটি সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠরূপ প্রকাশ পেয়েছে। মহুয়ার প্রেমিক দুর্বল, ভীরু নয়, মহুয়ার প্রেমিকা অবলা নয়— সে সবলা হয়ে পুরুষের সহধর্মিণী হবার যোগ্যতা লাভ করেছে। মহুয়ায় বীর প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলেছে—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

এবং সবলা নারীকে দিয়েও তিনি বলিয়েছেন নূতন বাণী—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী !
বীর-হস্তে বরমাল্য লব একদিন।

** ** **

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

—সবলা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কোথাও দীনাত্মার কাতরতা বা ভীরুতা প্রকাশ পায়নি, কোথাও হীন ভিক্ষাবৃত্তি প্রকাশ পায়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার উক্তিতে এমন একটা বলিষ্ঠতা আর নির্ভীকতা ফুটে উঠেছে যা অপূর্ব। পৃথিবীতে দুঃখ পেয়ে প্রিয়ার কাছে আসবো সান্ত্বনার জন্য,

সাংসারিক দুর্যোগে প্রিয়া হবে মনের আশ্রয়; সমস্ত কাজ, কোলাহল, বাস্তবের নির্মমতা থেকে সে হবে মধুর অবসর—প্রেম সম্বন্ধে এই রকম ধারণাই সাধারণত কবিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এর বিপরীত সুর বেজেছে। রবীন্দ্রনাথ কোন রকম দুর্বলতার উপর প্রেমের ভিত্তি স্থাপন করতে পরাঙ্মুখ। তিনি চান প্রেমিক আর প্রেমিকা দুজনে মিলে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবে—সব দুঃখ একসঙ্গে মাথা পেতে নিয়ে, সব দায়িত্ব একত্র বহন করবে। সত্যকারের প্রেমিক—যার অন্তরে সত্যকারের প্রেম আছে সে নির্ভীকভাবে তার প্রেমিকাকে বল্‌তে পারে—

সেবাকক্ষে করি না আহ্বান,—
শুনাও তাহারি জয়গান
সে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

(মহুয়া)

ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতায় এমনিতর তেজস্বিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার 'নির্ভয়' প্রভৃতি অনেক কবিতাই ব্রাউনিঙের সেই তেজস্বী পৌরুষকে মনে করিয়ে দেয়। মহুয়ায় কবি বলেছেন—

'দুঃখে-সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।'

দাম্পত্য-জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয়, একথা কবি উপলব্ধি করেছেন। তাই কবি বলেছেন যে বিপদ-আপদ বিঘ্ন এবং দুঃখকে অতিক্রম করে জয়ী হয়ে চলার মধ্যেই দাম্পত্য-জীবনের সার্থকতা। দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে যে দম্পতি অমৃত আহরণ করতে পারেন তাঁদের প্রেমই সার্থক।

রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্‌লা সাহিত্যেও বহু প্রেমের কবিতা রচিত

হয়েছে। ক্ষমতাশালী বহু কবির কল্পনামুখে নব নব ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। সে সব কবিতা উপলব্ধির জিনিস—সেজন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ সকল কবিতার ভাব আর বিশ্লেষিত হল না। উদ্ধৃত কবিতাবলী থেকে পাঠকবর্গ সহজেই সে সকল কবিতার ভাব ও রস গ্রহণ করতে পারবেন বলে আশা করি।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রেমের কবিতাসমূহ অনুশীলন করে পাঠকবর্গ যদি বাংলা প্রেমের কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা ও স্বরূপটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তবে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্চারিণী

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ॥
কি হেরিলুঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয় মাহা মোরি॥
যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ॥
যঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয়া বিথার॥
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ।
তঁহি তঁহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥
পুন কিয়ে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥ —বিদ্যাপতি

যেখানে যেখানে (সুন্দরী তাহার) পদযুগল ধরিতেছে (অর্থাৎ সুন্দরীর পদযুগল যেখানে যেখানে পড়িতেছে), সেখানে সেখানে যেন রক্তকমল ফুটিয়া উঠিতেছে। যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গকান্তি ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, সেখানে সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে! কি অপরূপ গৌরাঙ্গী আমি দেখিলাম, (তাহার রূপ-লাবণ্য) আমার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যেখানে তাহার দৃষ্টি পতিত হইতেছে, সেখানে সেখানে যেন কমল ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার লঘু হাসির সঞ্চার যেন অমৃত বিকীরণ করিতেছে। যেখানে তাহার কুটিল কটাক্ষ পড়িতেছে, সেখানে মদনের লক্ষ শর আসিয়া বর্ষিত হইতেছে। সেই সুন্দরী-সন্দর্শনে মনে হইতেছে যে সে যেন ত্রিভুবন আগলাইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ— তাহাকে একটু দেখিয়াই মনে হইতেছে যে, সে ছাড়া ত্রিভুবনের আর কিছুই যেন মনের সামনে উপস্থিত নাই। পুনরায় কি তাহার দর্শন পাইব, তবে আমার এই (মনো-) দুঃখ যাইবে।

সুন্দরী-সন্দর্শন

গেলি কামিনী গজহু-গামিনী
বিহসি' পালটি' নেহারি'।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী॥
জোড়ি' ভুজ যুগ মোড়ি' বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ-চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি' চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥ —বিদ্যাপতি

(সুন্দরী) গজগামিনী কামিনী মৃচকিয়া হাসিয়া, কটাক্ষে চাহিয়া চলিয়া গেল। ঐন্দ্রজালিক ফুলশর (মদনের পক্ষেও) ঐ নারীশ্রেষ্ঠ কুহকী হইল (মদনের ইন্দ্রজালে সকলে মুগ্ধ হয়, কিন্তু সেই সুন্দরীর কুহকে মদনও মুগ্ধ হইল)। তাহাতে আবার যুগল হস্ত ফিরাইয়া (সুন্দরী) সুন্দর মুখ বেষ্টন করিল, যেন কাম চম্পকদামে (=অঙ্গুলিদ্বারা) শারদচন্দ্র (মুখ) পূজা করিল। বক্ষস্থল চঞ্চল অঞ্চলে ঢাকিতে (সুন্দরীর) অর্দ্ধ পয়োধর দেখা গেল, যেন পবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া (=বায়ুর তাড়নায়) শরতের মেঘ (অর্থাৎ অঞ্চল) সুমেরু (অর্থাৎ পয়োধর) ব্যক্ত করিল—(বায়ু-তাড়নায় মেঘ অপসৃত হইয়া যেমন সুমেরু-শিখরের শোভা নয়নগোচর হয়, সেইভাবে অঞ্চলসদৃশ মেঘ অপসৃত হইয়া সুন্দরীর পয়োধর-শোভা ব্যক্ত হইল)। সুন্দরীকে পুনর্দর্শন করিয়া জীবন জুড়াইব, (তবে) বিরহের অবসান হইবে। তাহার চরণের অলক্তক (যাবক) হৃদয়াগ্নির মত আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।

চকিত দর্শন

গোধূলি পেখল বালা
যব মন্দির বাহর ভেলা,—
নব-জলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলা ॥
ধনি অলপ-বয়সী বালা,
জনি গাঁথলি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
রহল বিরহ-জ্বালা ॥

—বিদ্যাপতি

তরুণী গোধূলির আলোয় যখন মন্দিরের (=গৃহের) বাহির হইল, তখন তাহাকে দেখিলাম। সুন্দরীর রূপে সন্ধ্যার অন্ধকারের গায়ে যেন বিদ্যুৎ-রেখার ভ্রম উৎপাদন করিয়া গেল। সে রূপবতী,—অল্পবয়সী বালা,—যেন একগাছি সুগ্রথিত পুষ্পমালিকা। তাহাকে ক্ষণিক দর্শন করিয়া আশা মিটিল না, কেবল বিরহের জ্বালাই রহিল।

ভাদর বিরহ

সখি হে, হমর দুখক নাহি ওর রে[১]।
ঈ ভর বাদর মাহ[২] ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি' বরিখন্তিয়া[৩]।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া[৪] ॥
কুলিশ কত-শত- পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।[৫]
মত্ত দাতুরি[৬] ডাকে ডাহুকী,
ফাটি' যাওত ছাতিয়া[৭]।
তিমির দিগ ভরি' ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।[৮]
বিদ্যাপতি কহ— কৈসে গমায়ব[৯]
হরি বিনু দিন রাতিয়া।

—বিদ্যাপতি

১। সখি আমার দুঃখের সীমা নাই। ২। মাস। ৩। ঘন মেঘ ঝাঁপিয়া আসিয়াছে, চতুর্দ্দিকে মেঘ-গর্জ্জন উঠিতেছে এবং (মেঘ) ভুবন ভরিয়া বর্ষণ করিতেছে। ৪। (আমার) কান্ত (=প্রিয়তম) প্রবাসী (=পাহুন), অথচ নিদারুণ মদনদেব সঘনে খর শর আঘাত করিতেছেন। ৫। কত শত কুলিশ-(বজ্র-) পাতের শব্দে আমোদিত (—মোদিত) হইয়া ময়ূর সহর্ষে নৃত্য করিতেছে। ৬। দাদুরী=ভেক। ৭। ছাতিয়া=বক্ষ। ৮। চারিদিক ভরিয়া ঘন অন্ধকার, ঘোর রজনী, বিদ্যুৎপাত নিরন্তর হইতেছে। ৯। গমায়ব—যাপন করিব।

খেদ

সজনি ছোড়লুঁ[১] জীবন-আশা।
দারুণ বরিখা[২] জিউ ভেল অন্তর[৩]
নাহ[৪] রহল দূর-দেশা॥
বাদর দরদর নহি দিন-অবসর
গরগর গরজই রাতি।
অনিল অধীর থির নহে অন্তর
দমকত দামিনী-পাঁতি॥
ঘন ঘন ডাহুকি ডহ ডহ ডাকই
চাতক পিউ পিউ বোল।
নাচত মত্ত- শিখণ্ডক-মণ্ডল[৫]
দিশি দিশি দাতুরি-রোল॥
কোন কলাবতি কঠিন-হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ।[৬]
বিদ্যাপতি কহ ধনি উতপত[৭] নহ
তুরিতহিঁ[৮] মীলব কান॥

—বিদ্যাপতি

১। ছাড়িলাম। ২। বর্ষা। ৩। জীবন সংশয়। ৪। নাথ, প্রিয়তম। ৫। ময়ূর সকল। ৬। কোন্ নারীর হৃদয় এত কঠিন যে (এই ভরা বর্ষায়) প্রিয় বিনা সে প্রাণ রাখিবে? ৭। ব্যাকুলা। ৮। শীঘ্রই।

আশাহতা

সজনি, কে কহ 'আওব মধাই।'
বিরহ-পয়োধি- পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নহি পতিয়াই।[১]
এখন তখন করি' দিবস গমাওল,[২]
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি' বরষ গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥
বরষ বরষ করি' সময় গমাওল
খোয়লুঁ তনুক আশে,[৩]
হিমকর-কিরণ নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবীমাসে।[৪]
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে॥[৫]
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
অব নহি হোত নিরাশ।[৬]
সে ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতে মিলব তুয় পাশ॥[৭] —বিদ্যাপতি

১। সখি! কে বলে যে মাধব আসিবে? আমার বিরহের যে অবসান হইবে ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। ২। যাপন করিলাম। ৩। জীবনের আশা খোয়াইলাম (অর্থাৎ ত্যাগ করিলাম)। ৪। চন্দ্রের কিরণে যদি পদ্ম দগ্ধ হয়, (তবে) বৈশাখ মাসে কি করিবে? ৫। রৌদ্রতাপে যদি অঙ্কুরদগ্ধ হয়, তাহা হইলে বারিদ (জলবর্ষী) মেঘে কি করিবে (অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গেলে, তাহাতে জল দিলে কি হইবে)? এই নবযৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) প্রিয়তমের সে স্নেহ কি করিবে? ৬। নিরাশ হইও না। ৭। সেই হৃদয়-আনন্দকারী ব্রজনন্দন শীঘ্র তোমার নিকট আসিবে।

বিরহ

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥[১]
পিয়াক গরবে হাম কাহুক[২] ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা ॥[৩]
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল[৪] যদি কি আর জীবনে ॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।[৫]
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে ॥[৬]
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥[৭]
ভনয়ে বিদ্যাপতি—শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে, মিলব মুরারি ॥

—বিদ্যাপতি

১। প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হয় সেই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না; সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্ব্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন! ২। কাহাকেও। ৩। সেই প্রিয়ের জন্য কে আমাকে কি না বলিয়াছে! ৪। ভুলিল, বিস্মৃত হইল। ৫। পূর্ব্বজন্মে ভুলক্রমে বিধাতা আমার কপালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইল। ৬। আমার প্রিয়ের কোন দোষ নাই, আমার কর্ম্মফলই ফলিয়াছে। ৭। পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা—বক্ষপঞ্জর জর্জ্জরিত হইল।

আশান্বিতা

হমারি মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি' হেরব সে চন্দ-বয়ান॥
লহু লহু বোলব[1] যব হম নারি।
অধিক পিরিতি তব করব মুবারি॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
আপন মালতি-মাল হিয়সেঁ উতারি।
যতনে পরায়ব কণ্ঠে হমারি॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রস-আবেশে হম মুদব নয়ান॥

—বিদ্যাপতি

১। মৃদু মৃদু ভাষ।

মিলন-সৌভাগ্য

আজু রজনী হম ভাগে[১] পোহায়নু—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ[২] গেহ করি মানলুঁ,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।[৩]
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।[৪]
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ-বাণ অব লাখ-বাণ হোউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা॥[৫]
অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।[৬]
বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি নহ,[৭]
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥[৮]

—বিদ্যাপতি

১। সৌভাগ্যে কাটাইলাম। ২। গৃহ। ৩। আজ আমার দেহ দেহ হইল (দেহ ধন্য হইল)। ৪। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল, আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ৫। সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, লক্ষ চন্দ্রের উদয় হউক (কোকিলের কণ্ঠধ্বনিতে ও চন্দ্রের আলোকে পূর্ব্বে আশঙ্কা হইত, বিরহের সন্তাপ বাড়িত। এখন আর তাহাদিগকে ভয় করি না)। (মদনের) পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মন্দমলয় পবন প্রবাহিত হউক (ইহাদিগকেও এখন আর ভয় নাই)। ৬। এখন আমার যখন প্রিয়সঙ্গ হইবে (প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে) তখনি নিজের দেহ সার্থক মানিব। ৭। তুমি অল্প ভাগ্যবতী নহ। ৮। তোমার চিরনূতন প্রেম ধন্য।

অতৃপ্তি

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ,—
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ,—
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ,—
ন বুঝলুঁ কৈসন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ,—
তব হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ-জন রস-অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।[১]
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

—বিদ্যাপতি

১। বিদগধ—রসিক। আমি তো ঢের রসিক দেখিয়াছি। কিন্তু এমন রসানুভাব তো কাহারও দেখি নাই।

আক্ষেপ

আগোর[1] চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বুল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়ে সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব[2] কত নাহি ছুটে নেহা[3]॥
কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি বিষ খাঞা[4] মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
চণ্ডীদাস বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

১। অগুরু। ২। যাপন করিব। ৩। প্রেম। ৪। খাইয়া

বিরহ

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো[1] এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে[2]॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদিনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥ —বড়ু চণ্ডীদাস

১। রাত্রিতেও। ২। চক্ষুতে নিদ্রা আসে না।

বিরহ-সন্তাপ

কানু নাহি আইল মোর ঘরে।
কাহার লাগিয়া মুঞী সাজ সাজিলাম গো
পরাণ কেমন কেমন করে॥
চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়এ গো
বিষ লাগে মলয়েরি বাত।
সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো
ফুল হেরি ফুলশরাঘাত॥
বক্ষের পঞ্জরে মোর বাজ বাজিছে গো
দারুণ কুহু কুহু রা।
কুঞ্জ যেন বন্দী-জালে ঘেরিয়া রেখেছে গো
পথ নাহি মিলে এক পা॥
আপনা আপনি মুঞী বৈরী বাসিয়ে গো
বাঁচি যদি ছাড়িয়ে পরাণে।
নয়নের জল মোর করিবে কি উপায় গো
বড় কহে বাসলী চরণে॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

রূপ-মুগ্ধ

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি,
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি' তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করে সে আসন,
এলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ-কুচ-মূলে হেমহার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি'॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুব-রাশি।
কান্দিয়া আঁধার কনক-চাঁদার
শরণ লইল আসি।
কিবা সে ভুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশী-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি' নিঙ্গাড়ি'
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥

—চণ্ডীদাস

প্রিয়-নাম

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম !
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি বা হয় ![১]
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈসে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥[২]

—চণ্ডীদাস

১। শুধু নামের প্রতাপে (নাম শুনিয়া, নাম জপ করিতে করিতে) যখন আমার অঙ্গ এইরূপ অবশ হইয়া আসিতেছে, প্রাণ আকুল করিতেছে, তখন তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয় ?” ২। কুলবতী কুল নাশে……যৌবন যাচায়=কুলনারী আপনার কুল নষ্ট করিবার জন্য যাচিয়া যৌবন সমর্পণ করে। (নায়ক-নায়িকার প্রেমে যে আত্মসমর্পণের আত্মাভিমান বিলয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে-পাওয়া যায়, তাহার কথাই এই কবিতার মূলে রহিয়াছে)

আশা

সখি, আমার অঙ্গে যদি মিলাইত কালিয়া।
বঁধুরে রাখিতাম আমি হিয়ার মাঝে লুকাইয়া ॥
শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
নয়নে থুইতাম আমি জনমের মত ॥
অতসী-কুসুম হইত শ্যাম।
আমার কালো কেশে লোটনে[১] বাঁধিয়া রাখিতাম ॥
সখি, চন্দন হইত শ্যামরায়।
মাখিয়া রাখিতাম আমি সকল গায় ॥

—চণ্ডীদাস

১। খোঁপায়।

অপূর্ব প্রেম

এমন পীরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে[১] মানয়ে যুগ, কোরে[২] দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই[৩]।
সুখের সায়রে ডুবি' অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হইলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি' যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে—ধনি সব পরমাণ ॥

—চণ্ডীদাস

১। নিমেষে। ২। কোলে ৩। যাপন করি।

মিলনে বিচ্ছেদ

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।[১]
মানুষে এমন প্রেম কোথাও না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি—সেহো হেন নয়।[২]
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥[৩]
কুসুমে মধুপ কহি—সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥[৪]
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

—চণ্ডীদাস

১। জল ছাড়া হইয়া মাছ যেমন একদণ্ডও বাঁচে না। ২। সূর্য্য এবং কমলের প্রেম চিরবিখ্যাত, সেও এমন নহে। ৩। চাতক ও মেঘের প্রেমের সহিতও এ প্রেমের তুলনা হয় না, (কারণ) সময় না হইলে মেঘ (চাতককে) এক বিন্দু জল দেয় না। ৪। কুসুম ও মধুকর পরস্পরের প্রেমও ছার। ভ্রমর না আসিলে, ফুল ত তাহার কাছে যায় না!

অচ্ছেদ্য মিলন

ললিতার কথা শুনি'   হাসি' হাসি' বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম   মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর   এ ঘর মন্দিরে গো
রতন পালঙ্কে বিছা[১] আছে।
অনুরাগের তুলিকায়   বিছান হয়েছে, তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম   মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে   বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা   ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে   হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

—চণ্ডীদাস

১। বিছানা, শয্যা।

অভিশাপ

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোক অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরেব পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥

—চণ্ডীদাস

মিলনানন্দ

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
এ-সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোলে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

—চণ্ডীদাস

অবিচ্ছেদ্য প্রেম

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা[১]।
কি জানি কি লাগি' কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি' দেহা॥

সই, কিবা সে পিরিতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে,
কি দিয়া শোধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল[২] হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে— আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায়॥

—জ্ঞানদাস

১। প্রীতি, প্রেম। ২। ব্যাকুল

চিত্তহার

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল,
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।[১]
ঘরে যাইতে মোর পথ হইল অফুরান—
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ!
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা,
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥[২] —জ্ঞানদাস

১। বনে যেমন পথিক পথ হারায়, তেমনি আমার মন যৌবনের শোভায় বিভ্রান্ত হইয়াছে। ২। চন্দনের চন্দ্রাকৃতি গোল ফোঁটার মধ্যে কস্তুরীর বিন্দু দেখিয়া দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে আমার হৃদয়-পুতলী বাঁধা পড়িয়াছে।

দেখা-দেখি

যবে দেখা-দেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরিতি-আরতি দেখি' হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে॥
আহা মরি মরি, মুঞি কি কব আরতি।
কি দিয়া শোধিব শ্যাম-বঁধুর পিরিতি॥
রসিয়া-নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়— তোমার চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা কায় তুমি॥

—জ্ঞানদাস

আকুতি

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পুতলি মোর স্থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব আমি কি আর বলিব।
যে পণ করেছি আমি সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি' আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার॥
গুরু-গরবিত-মাঝে বসি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরায় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

—জ্ঞানদাস

প্রেমের দুঃখ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সখি হে, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে॥

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ,—
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে— কানুর পিরিতি
মরণ অধিক শেল॥

—জ্ঞানদাস

নৃত্যশ্রী

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥
কি বা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরয রহিল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল,—
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ,—
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

—গোবিন্দদাস

আকাঙ্ক্ষা

যাহাঁ পহু [১] অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত [২] ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি, বিরহ মরণ নিরদন্দ্ব।
ঐছনে মিলব যব গোকুল চন্দ [৩] ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ-জোতি হোই তথি মাহ॥ [৪]
যো বীজনে [৫] পহুঁ বীজই [৬] গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম [৭] ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥ [৮]

—গোবিন্দদাস

১। প্রভু। ২। যেখানে যেখানে প্রভুর অরুণ-চরণপাত হয়, আমার গাত্র যেন সেই সেই স্থানের ধরণী হয়। ৩। শ্যামের মিলনে মৃত্যু ও বিরহ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যায়। তাহারা আর কোন বিরোধ রাখে না। ৪। যে দর্পণে প্রভু তাঁহার মুখ দেখেন, আমার অঙ্গ যেন তাহার মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপা হইয়া বিরাজ করে। ৫। পাখা ৬। বাতাস করেন ৭। স্থান ৮। গোবিন্দদাস বলেন যে কৃষ্ণ মরকতমণির সদৃশ, আর রাধা কাঞ্চনতুল্য। স্বর্ণের আধার পাইলেই মণির দীপ্তি খুলে, অতএব কৃষ্ণ তোমাকে ছাড়িবেন না—কারণ মরকতসদৃশ মণি যে কৃষ্ণ, তিনি কাঞ্চনতুল্য তোমাকে ছাড়িলে শোভা পাইবেন না।

নিতুই নব

তুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
তুহুঁ রূপ নিতি নিতি তুহুঁ হিয়ে জাগ॥
তুহুঁ মুখ চুম্বই, তুহুঁ করু কোর।
তুহুঁ পরিরম্ভণে [১] তুহুঁ ভেল ভোর॥
তুহুঁ তুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম [২]।
নিতি নব আরতি, নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরত গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাস

১। আলিঙ্গন। ২। দারিদ-হেম—দরিদ্রের সোনা। দরিদ্র যেমন আগ্রহের সহিত সোনা আগলায়, সেইরূপ তুইজনের প্রণয়ের আগ্রহ।

গোপন-মিলন

প্রাণনাথ, পরাণ কেমন করে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে যাব ঘরে॥
পুরুবে যতেক করিলুঁ সুতপ—
তপের নাহিক সীমা।
সেই-সব তপ বিফল নহিল,
তেঞিসে পাইলুঁ তোমা॥
মৃগমদ বলি' ঝাঁপিয়া কাঁচলি
রাখিব হিয়ার মাঝে।
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া
রাখিব লোকের লাজে॥
কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে
রাখিব যতন করি'।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া
দেখিব নয়ান ভরি'॥
যদি কদাচিত হয় জানাজানি,—
কহিব বেকত করি'।
সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত—
কহে দাস নরহরি॥

—নরহরি দাস

প্রেমের দুঃখ

না জানিয়া, না শুনিয়া পিরীতি করিলাম গো,
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে,
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো,
মনের অনলে আমি পুড়ি।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো
পাকানিয়া পাটের ডুরী॥ [১]
আন্ধুয়া পুখরে যেন [২] দীন হীন মীন হেন
নিঃশ্বাস ছাড়িতে ঠাঞি নাই।
বাসুদেব ঘোষ কহে— ডাকাত্যা পিরিতি গো,
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥—বাসুদেব ঘোষ

১। পাকানো পাটের দড়ি ২। এঁধো পুকুর, যাহার সহিত বাহিরের জলস্রোতের কোন সম্বন্ধ নাই।

বংশীধ্বনি

বাঁশী বাজান জান না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী, আর আমি মইরি লাজে॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী, সে ঝাড়ের লাগি পাওঁ।
জড়ে-মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ॥
চাঁদ কাজি বলে—বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি, না দেখিলে হরি॥ —চাঁদ কাজি

সাধ

এস এস বঁধু এস, আধ-আঁচরে বস,
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
বঁধু তুমি মণি নও, মাণিক নও, হার করে গলায় পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
আমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো,
তাহে পরিজন-পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো,
লোচনদাসের এই সাধ॥

—লোচনদাস

পিরিতি পিয়া সে জানে

সই, পিরিতি পিয়া সে জানে।

যে দেখি যে শুনি　　চিতে অনুমানি

নিছনি দিয়ে পরাণে॥

মো যদি সিনাঙ　　আগিলা ঘাটে

পিছিলা ঘাটে সে নায়।

মোর অঙ্গের জল-　　পরশ লাগিয়া

বাহু পসারিয়া রয়॥

বসনে বসন　　লাগিবে লাগিয়া

একই রজকে দেয়।

মোর নামের আধ　　আখর পাইলে

হরিষ হইয়া লেয়॥

ছায়ায় ছায়ায়　　লাগিব লাগিয়া—

ফিরয়ে কতেক পাকে।

আমার অঙ্গের　　বাতাস যে দিগে

সে মুখে সে দিন থাকে॥

মনের আকুতি　　বেকত করিতে

কত না সন্ধান জানে।

পায়ের সেবক　　রায়-শেখর

কিছু বুঝে অনুমানে॥

—রায়শেখর

সে কাল গেল বৈয়া

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু
সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি-ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত কিছু বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা—
আর যে চিনিবা কেনে॥
কুলি[১] বেড়াইয়া নাম লইয়া
ফিরিতা বংশী বাইয়া[২]॥
মুখের কথা শুনিতেহ কত
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলুঁ
কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে— পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥

—শেখর

১। সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া। ২। বাজাইয়া।

কিবা সে তোমার প্রেম !

কিবা সে তোমার প্রেম— কত লক্ষকোটি হেম,
নিরবধি জাগিছে অন্তরে ।
পুরুবে আছিল ভাগি[১] তেঞি পাইয়াছি লাগি,
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের তরে ॥
কালিয়া বরণখানি— আমার মাথার বেণী—
আঁচরে[২] ঢাকিয়া রাখি বুকে ।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ পূরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ লোকে ॥
মণি মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লব,
ফুল নও কেশে করি বেশ ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতুঁ[৩] দেশ দেশ ॥ —নরোত্তম দাস

১। ভাগ্য। ২। আঁচল। ৩। ফিরিতাম।

অভিমানান্তে

তুহুঁ মুখ দরশনে তুহুঁ ভেল ভোর ।
তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥
তুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস ॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ ।
মান বিরামে ভেল একসঙ্গ ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুহুঁ জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে তুহুঁ কেলি-বিলাস ।
দূরহি নেহারত নরোত্তমদাস ॥ —নরোত্তমদাস

ফাঁদ

মরম কহিলুঁ,— মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরিতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগিয়া থাকে,
তমু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহোঁ, পিয়া গলায় পরয়ে,
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াথ না পায়[১]॥

—বলরামদাস

১। আমি হার নহি যে প্রিয় আমাকে গলায় পরিয়া রাখিবে। আমি চন্দন নহি যে প্রিয় আমাকে গায়ে লেপিয়া রাখিবে। আমি আমার প্রিয়ের কাছে বহুমূল্য রত্ন-সদৃশ দুর্লভ বোধ হই, তাই সে আমাকে যে কোথায় কেমন করিয়া রাখিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্বস্তি পায় না।

অভেদাত্মা

ও হে পরাণ-বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার॥
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমারে তোমার দিয়া, তোমার হইয়া রব॥

—সৈয়দ মর্তুজা

অপরূপ পেখলুঁ বালা

সখিহে, অপরূপ পেখলুঁ বালা।
হিমকর-মদন- মিলিত মুখমণ্ডল
তা'পর জলধর-মালা॥
চঞ্চল নয়নে হেরি' মুঝে সুন্দরী মুচকাই ফিরি' গেল।
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন [১] না হেরি,
অনুখন সোই ধেয়ান।
তাকর[২] পীরিতি কি রীতি, নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

—রাধাবল্লভ

১। অন্য। ২। তাহার।

খেদ

তুমি দিবাভাগে লীলা-অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সম কাল[১] মানি সুজঞ্জাল[২]
যুগ-তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন স্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল[৩] কত সুনির্মল
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে এ দুই নয়নে
নিমেষ দিয়েছে কেবা॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় প্রাণনাথ বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥ —রামী

১। পাঁচ সেকেণ্ড্ পরিমাণ কাল। ২। জঞ্জালসদৃশ (বিষতুল্য) মনে হয়। ৩। কোঁকড়ান চুল।

বিরহান্তে মিলন

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
বিরহ-বিপতি দুখ দোঁহ দোহেঁ কহি।
প্রেম-আনন্দে দুহুঁ লুঠত মহি॥
পুন উঠি পুন পড়ি পুন দেই কোর।
আনন্দে নিমগন দুহুঁ ভেল ভোর॥ —প্রেমদাস

আসন্ন বিয়োগ-ব্যথা *

এখন হইনু রূপের নারী, তোরে যোগ্যমান্।
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস, মুই তেজিমু পরাণ ॥[১]
তোমার আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক ঝরিয়া।
পাকিলে মাথার চুল, যাবেন সন্ন্যাসী হইয়া ॥[২]
এ রঙ্গ মালতীর ফুল, ভরে নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়ে রঙ্গ-রূপ রাখিব কতকাল ॥[৩]
কতকাল রাখিব যৌবন, বান্ধিয়া-ছান্দিয়া।
নিরবধি ঝোরে প্রাণ স্বামী বলিয়া ॥[৪]

—ময়নামতীর গান

* ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গান বহুকাল ধরিয়া বাঙ্লায় জনপ্রিয় হইয়া আছে। এই গীতিকার নায়ক গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তাঁহার স্ত্রী এই উক্তি করিয়াছিলেন।

১। অল্পবয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল, এখন আমি তোমার উপযুক্ত রূপবতী নারী। আমাকে ছাড়িয়া তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আমি আর প্রাণধারণ করিতে পারিব না। ২। তোমার নিকটে থাকিয়া আমার যৌবন বিগত হইলে এবং মাথার কেশ পক্ক হইলে তখন সন্ন্যাসী হইও। ৩। মালতী ফুলের ভারে মালতী-লতার ডাল নুইয়া পড়ে—তাহার ফুলের শোভাও বেশীদিন থাকে না। আমি নারী, আমার যৌবনশ্রীও মালতী ফুলের ন্যায়। আমি আমার রূপ-রঙ্গ কতকাল বজায় রাখিব? ৪। আমি আমার যৌবন কতকাল বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিব? নিরবধি স্বামীর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে।

বিদায়-কালে

না যাইও, না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর—
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ?
নিদের স্বপনে রাজা, হবে দরশন,
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত—নাই প্রাণের ধন !
দশ গৃহের মা-বইন রবে, স্বামী লইয়া কোলে,
আমি নারী রোদন করিব, খালি ঘর মন্দিরে।
জীয়ব, জীবন-ধন, আমি কন্যা সঙ্গে গেলে,
রান্ধিয়া দিমু অন্ন তোমার ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানী,
হাসিয়া-খেলিয়া পোহামু রজনী।
শীতলপাটী বিছাইয়া দিমু, বালিসে হেলান পাও,
হাউস রঙ্গে [১] যাঁতিমু [২] হস্ত পাও।
গ্রীষ্মকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখা বাও,
মাঘ মাসের শীতে ঘেঁসিয়া রমু গাও।

—ময়নামতীর গান

১। অনুরাগের সহিত। ২। চাপিয়া দিব।

পথে নারী বিবর্জিতা

"আমার সঙ্গে যাবু রাণি—পন্থের শোন্ কাহিনী,
খিদা লাগ্‌লে অন্ন পাবু না, পিয়াস লাগ্‌লে পানী।
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার,
যে দিকে হাঁটে হাড়ি-গুরু [১] দিনতে আন্ধার।
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পন্থ [২] বাইয়া যায়
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে, নারী ধরি' খায়।
খাইবে না খাইবে বাঘে, ফ্যালাবে মারিয়া,
বৃথা কাজে ক্যান্ মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া ?"
রাণী কইছে, "শুন, রাজা, রসিক নাগর,
কারে কয় এগিলা কথা [৩], কে আর পইতায় [৪] ?
এমন দুষ্ট বনের বাঘ স্ত্রী পুরুষ বাছিয়া খায়!
থাক্‌না ক্যানে বনের বাঘ, তাক না করি ডর—
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক স্বামীর পদের তল।"

—গোপীচন্দ্রের গান

* পত্নীর বিরহ-সন্তাপ শুনিয়া গোপীচন্দ্রের উক্তি। উত্তরে গোপীচন্দ্রের পত্নীর উক্তি। গোপীচন্দ্রের পত্নীর উক্তিতে বেশ একটু humour-এর সৃষ্টি কবি করিয়াছেন।

১। গুরু হাড়ি পা। ২। পথ। ৩। এ সকল কথা। ৪। প্রত্যয় করে।

যৌবন হইল বৈরী

তোমা সঙ্গ প্রীতি করি আনলে দহিয়া মরি
পাঞ্জার বিন্ধিল কাল ঘুণে।
যদি মণি মুক্তা হৈত হার গাথি গলে দিত [১]
পুষ্প নহে কেশেত রাখিতাম॥
আসিব আসিব করি আমি রৈলাম পন্থ হেরি
নয়ান হইয়া গেল ঘোর॥
যে দিন আসিলু শিশু না জানিলাম তুঃখ কিছু
এবে যৌবন হইল পূরণ।
যৌবন হৈল কাল মরিলে সে হয় ভাল
এরূপ যৌবন বৃথায় গেল॥
এরূপ যৌবন-ধন হারাইলাম অকারণ
বৃথায় বৃথায় গেল দিন গণিয়া।
যৌবন হৈল বৈরী সম্বরি রাখিতে নারি
না ভজিল প্রিয়া গুণনিধি॥

—গোপীচন্দ্রের গান

১। হার গাঁথিয়া দিতাম।

জীবন অসার *

দিনে থাকি গৃহকাজে, সকল সুখেরি মাঝে,
যামিনী আইলে মোর কাল।
জ্বালায় মন্দির পথে, প্রবেশ করিব তাতে,
হিমকর-কর-শরজাল ॥
স্বপনে দেখিলুঁ আমি, একত্র শয়নে স্বামী,
বাহু পসারিয়া কৈলুঁ কোলে।
স্বপনে পাইয়া নিধি পুন বিড়ম্বিল বিধি,
চিয়াইল পিক কোলাহলে ॥
অশোক কিংশুক ফুল, রইল লোচন-শূল,
কেতকী কুসুম কামকুন্ত।
বৈরী কুসুম-বাণ, অস্থির করয়ে প্রাণ,
ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥
দুঃসহ মদন-শরে সর্প দংশে কলেবরে,
শীতল চন্দন হলাহল।
কুটিল কোকিল-রব, দহে মোর তনু সব,
কাননে যেমন দাবানল ॥
শুইলে নলিনী-দলে, কলেবর মোর জ্বলে,
জল দিলে নাহি প্রতিকার।
মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ,
পতি বিনে জীবন অসার ॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

* চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান আছে। ধনপতি সদাগরের পত্নী খুল্লনা। সদাগর বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে গেলে খুল্লনা বিলাপ করিতেছে।

কোকিলের প্রতি

কোকিল রে, কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশ উগারহ নিত্য বিষ,
বিরহী জনের পোড়ে গা॥
নন্দন কাননে বাস সুখে থাক বার মাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে বা তোরে বলে ভাল অন্তরে বাহিবে কাল,
বধ কৈলি অনাথা যুবতী॥
আর যদি কাড় রা বসন্তের মাথা খা,
মদনের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা
কাল সাপ কালিয়া বরণ।
সদাগর আছে যথা কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ।
খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল,
যোষা [১] বধ করহ কি রীতি [২]।
পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন,
মুকুন্দের মধুর ভারতী॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

১। কামিনী। ২: কেন।

অনুরাগ-সঞ্চার

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায় ॥
এই ত কেশ কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল ॥
ডাগল [১] দীঘল আঁখি, যার পানে সে চায়।
একবার দেখিলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন ॥
জাগিয়া দেখেছি কি বা নিশির স্বপন।
কার ঘরের সুন্দরী নারী, কার পরাণের ধন ॥
জলের না পদ্মফুল, শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া [২] ॥

—ময়মনসিংহ গীতিকা
(চাঁদবিনোদ ও মলুয়ার কাহিনী)

১। ডাগর। ২। জলের পদ্মফুল যেন ডাঙ্গায় ফুটিয়া রহিয়াছে, অথবা আকাশের তারা (ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া) মঞ্চে ফুটিয়াছে।

অনুরক্তা

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে, যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু, দেখা তোমার সনে ॥
তুমি যদি হইতারে বন্ধু, আসমানের চান।
রাত্র-নিশা চাইয়া থাক্‌তাম খুলিয়া নয়ান ॥
তুমি যদি হইতারে বন্ধু, ঐ সে নদীব পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণী ॥
একেত অবলা নারী, ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই ॥
যেদিন দেখ্যাছি তোমায়, ঐ না জলের ঘাটে।
সেইদিন হইতে মন ফিরে বাটে বাটে ॥

—চন্দ্রাবতী
ময়মনসিংহ গীতিকা

প্রেম-সঞ্চার

যে দিন হইতে দেখ্ ছি, বন্ধু
তোমায়
মৈষালের বাড়ী,—
সেই দিন হইতে, বন্ধু,
আরে বন্ধু,
পাগল হইয়া ফিরি।
আন্ধাইরে [১] ডুইবাছে, বন্ধু,
আরে বন্ধু,
চন্দ্র সূর্য তারা,
তোমারে দেখিয়া, বন্ধু,
আরে বন্ধু,
হৈছি আপন-হারা।

*　　*　　*　　*

বাইরেতে শুনিলে বন্ধু,
আরে বন্ধু,
তোমার পায়ের ধ্বনি,
ঘুম হইতে জাইগা উঠি, বন্ধু
আরে বন্ধু,
আমি অভাগিনী।
বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু,
আরে বন্ধু,
মুখ ফুটিয়া না পারি,
অন্তরের আগুনে, বন্ধু
আমি
জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরি।

১। আঁধারে।

পাখী যদি হইতারে বন্ধু,
আরে বন্ধু,
রাখ্‌তাম হৃদ্-পিঞ্জরে, ;
পুষ্প হইলে বন্ধু,
আরে বন্ধু,
গাইথা [২] রাখ্‌তাম তোরে।
চান্দ যদি হইতারে বন্ধু,
আরে বন্ধু,
জাইগা সারা নিশি
চান্দ-মুখ দেখিতাম, বন্ধু,
আরে বন্ধু,
নিরালায় বসি'।
একদিন দেখা রে বন্ধু,
মৈষালের বাথানে ;
চান্দ মুখ দেইখারে, বন্ধু,
মজিছে পরাণে।
বাটা ভরি বানাইয়া পান, রে বন্ধু
তোরে দিতে লাজ বাসি,
আপনার চক্ষের জলে, বন্ধু,
আরে বন্ধু,
আপনি যাই ভাসি'।
কত দিনের বন্ধুরে আমার
আওব সুখের দিন[৩],
তোমার লাগ্যা
ভাইব্যা[৪] আমার
যৌবন হইল ক্ষীণ॥ —দ্বিজ ঈশান
ময়মনসিংহ গীতিকা

২। গাঁথিয়া। ৩। কত দিন বাদে হে বন্ধু আমার সুখের দিন আসিবে? ৪। ভাবিয়া।

ব্যক্ত প্রেম

"জল ভর সুন্দরী কইন্যা
জলে দিছ মন,
কাইল যে কইছিলাম কথা
আছে নি স্মরণ।"
"শুন শুন, ভিন দেশী কুমার,
বলি তোমার ঠাঁই,
কাইল বা কি কইছিলা কথা
আমার মনে নাই।"
"নবীন যইবন কইন্যা,—
ভুলা তোমার মন,
এক রাতিরে এই কথাটা
হইলে বিস্মরণ।"
"তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ,
আমি ভিন্ন নারী,
তোমার সঙ্গে কইতে কথা
আমি লজ্জায় মরি।"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা
জলে দিছ ঢেউ,
হাসি মুখে কওনা কথা,
সঙ্গে নাই মোর কেউ।
কেবা তোমার মাতা কইন্যা,
কেবা তোমার পিতা,
এই দেশে আসিবার আগে
পূর্বে ছিলি কোথা?"

নাহি আমার মাতা পিতা
গর্ভ সুদর[১] ভাই,
সুতের হেওলা[২] অইয়া
ভাইস্যা বেড়াই।
কপালে আছিল লিখন
বাইদ্যার[৩] সঙ্গে ফিরি,
নিজের আগুনে আমি
নিজে পুইর‍্যা মরি।
এই দেশে দরদী নাইরে
কারে কইবাম কথা,
কোন্ জন বুঝিবে আমার
পুরা[৪] মনের বেথা!
মনের সুখে তুমি ঠাকুর,
সুন্দর নারী লইয়া,
আপন হালে করছ ঘর
সুখেতে বান্ধিয়া।"
ঠাকুর বলে, "কইন্যা তোমার,
শানে বান্ধা হিয়া,
মিছা কথা কইছ তুমি,
না কইরাছি বিয়া।"
"কঠিন তোমার মাতা পিতা
কঠিন তোমার প্রাণ,
এমন যইবন তোমার
যায় অকারণ।

১। সহোদর। ২। স্রোতের সেওলা। ৩। বেদের। ৪। পোড়া।

কঠিন তোমার মাতা পিতা,
কঠিন তোমার হিয়া,
এমন যইবন কালে
নাহি দিছে বিয়া !"
"কঠিন আমার মাতা পিতা
কঠিন আমার হিয়া,
তোমার মত নারী পাইলে
করি আমি বিয়া।"
"লজ্জা নাইরে নির্লজ্জ ঠাকুর,
লজ্জা নাইরে তর,
গলায় কলসী বাইন্ধা
জলে ডুব্যা মর্।"
"কোথায় পাব কলসী কইন্যা,
কোথায় পাব দড়ী,
তুমি হও গহীন গাঙ্গ,
আমি ডুব্যা মরি !"

—দ্বিজ কানাই

ময়মনসিংহ গীতিকা

বিরহে মিলন

মেওয়া মিশ্রী সকল মিঠা,
মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ
শীতল ডাবের জল॥
তার থাক্যা মিঠা দেখ,
দুখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন
ভরে খালি বুক॥
তার থাক্যা মিঠা যদি
পায় হারানো ধন।
তার থাক্যা অধিক মিঠা
বিরহে মিলন॥

—ময়মনসিংহ গীতিকা

মোহ

কি রূপসী অঙ্গে বসি' অঙ্গ খসি' পড়ে।
প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ কুচ পীন শশহীন শশী।
আস্যবর হাস্যোদর বিম্বাধর রাশি॥
নাসাতুল তিলফুল চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি সুধাবৃষ্টি লোকদৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী শিশু অলি কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অণু কামধনু হেমতনু সাজে॥

নীলগিরি শুকপুরী তনুপরি ভৃঙ্গ।
মঞ্জুরব মনোভব মহোৎসব বঙ্গ॥
নৃপসুত মোহযুত এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম অনুপাম গুণধাম এ কি॥

—রামপ্রসাদ সেন

বিরহ-বর্ণন

প্রথমে প্রবেশ মেঘ কান্ত যায় দূরদেশ
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর শরে তনু জরজর
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই॥
মলিন বদন-শশী ভাবয়ে ভুবনে বসি'
নীরে পশি, নহে ভক্ষি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরে জীয়ে পুনঃ সেই
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
ঘন ঘন ঘন রব অবশ শরীরে সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্ব কুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥

—রামপ্রসাদ সেন

আধুনিক যুগের

কবে হইবে মিলন

তোমার আশাতে এ চারি জন—
মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন।
আছে অভিভূত হয়ে সর্বক্ষণ—
দরশ পরশ শুনিতে সুভাষ
করিতেছে আবাহন॥
অন্য রূপ আঁখি না হেবে আর,
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার!
শয়নে-স্বপনে মন ভাবে মনে—
কবে হইবে মিলন॥

—হরু ঠাকুর

নয়নে নয়নে

নয়নে নয়নে আলিঙ্গন
মনে মনে মিলিল!
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর—
অন্তরে অন্তর পশিল!
উভয়ের প্রেমগুণে বাঁধা গেল দুইজনে
স্বভাবে স্বভাব মজিল।

—রামনিধি গুপ্ত

প্রিয় সন্দর্শনের আনন্দ

যবে তারে দেখি, অনিমেষ আঁখি
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন হয় মোর মন
শুন লো সজনি।
তৃষিত চাতকী যেন
নিরখিয়ে নবঘন—
বিনা বারি পানে কত সুখ মনে
কে জানে না জানি।

—রামনিধি গুপ্ত

মর্মব্যথা

সখি, সে কি তা জানে
আমি যে কাতরা তারি বিরহবাণে!
নয়নেরি বারি নয়নে নিবারি
পাশরিতে নারি সেই জনে
এখনো রয়েছে প্রাণ তাহারি ধ্যানে।

—রামনিধি গুপ্ত

স্বপ্ন মিলন

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
না করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি
মনপ্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হলে না রবে জীবন॥

—আশুতোষ দেব

পলাতকের প্রতি

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ
বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছুকাল থাক থাক বলে
ধরে রাখবো না।

শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হলো এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙেছে, ভেঙেছে,
তায় লজ্জা কি!
এমন ত প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচেও মাণিক পেলেম না॥

—রাম বসু

মনোবেদনা

মনে রইল সই মনের বেদনা!
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না,—
সরমে মরমের কথা কওয়া হলো না!
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি! ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে—
নারী জনম যেন আর করে না।

—রাম বসু

কোকিলের প্রতি

কোকিল ! কর এই উপকার—
যাও নাথের নিকটে একবার,
ব্যথায় ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিঠুর নাগর আছে যথায়
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায়—
শুনে তব ধ্বনি বলিয়ে দুঃখিনী
অবশ্য মনে হইবে তার।
হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিল বুঝি নাই সেই দেশে ?
তা যদি থাকিত তবে সে আসিত
বসন্ত সময়ে নিবাসে।

—রাম বসু

পঞ্চশরের ভুল

হর নই হে ! আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
হায়, শুন শম্ভু-অরি ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরী হয়ো না আমার।

বিচ্ছেদে এ দশা বিগলিত কেশা,
নহে এ তো জটাভার।
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই, মাখি নাই বিভূতি।

—রাম বসু

[প্রিয়বিচ্ছেদে প্রেমিকার লাবণ্য বিবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার আকৃতি শঙ্করের মত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া শম্ভু-অরি মদন তাঁহাকে জ্বালাইতে আসিয়াছে। মদনের আবির্ভাবে ঐ প্রেমিকাই রতিপতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বিচ্ছেদে তাঁহার এ দশা হইয়াছে—বিচ্ছেদের ফলে তাঁহার কেশরাশি জটাজালে পরিণত, প্রিয়বিচ্ছেদে তাঁহার অঙ্গ ধূলায় ধূসর। তিনি হর নহেন, তিনি ভস্ম মাখেন নাই,—মদন যেন ঐ ধূলিধূসর মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে হর বলিয়া ভুল করিয়া পঞ্চশরের আঘাতে জর্জরিত না করে।]

যদি

তব প্রেমে কি সুখ হত—
আমি যারে ভালবাসি
সে যদি ভালবাসিত !
প্রেম-সাগরের জল
তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল
যদি তাহে না থাকিত !

—শ্রীধর কথক

অহেতুক প্রেম

ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেজন্য দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥

—শ্রীধর কথক

মান

মনে মনে সাধ রে,
কে আগে সাধিবে বলো? ঘটিল প্রমাদ রে!
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল,
উভয়ে ছাড়িতে নারে মান-অনুরোধ রে!

—শ্রীধর কথক

অটুট

সই, যে যার মরমে লাগে
সে কি তারে ত্যজিতে পারে ?
না ঘুচে আঁখির আশা
ও-মুখ হেরে।
যার যাতে মজে মন,
সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ
করে তাহারে।

—কালী মীর্জা (মুখোপাধ্যায়)

অভ্যর্থনা

বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে॥
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোমার গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
দিব এই হৃদয় পেতে,
পীরিতি মরম-মধু দিব তোমায় খেতে।
বিচ্ছেদেরে বেঁটে এনে ফেলব পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেয়ার ডালে॥

—অজ্ঞাত কবি

আধুনিক
যুগ
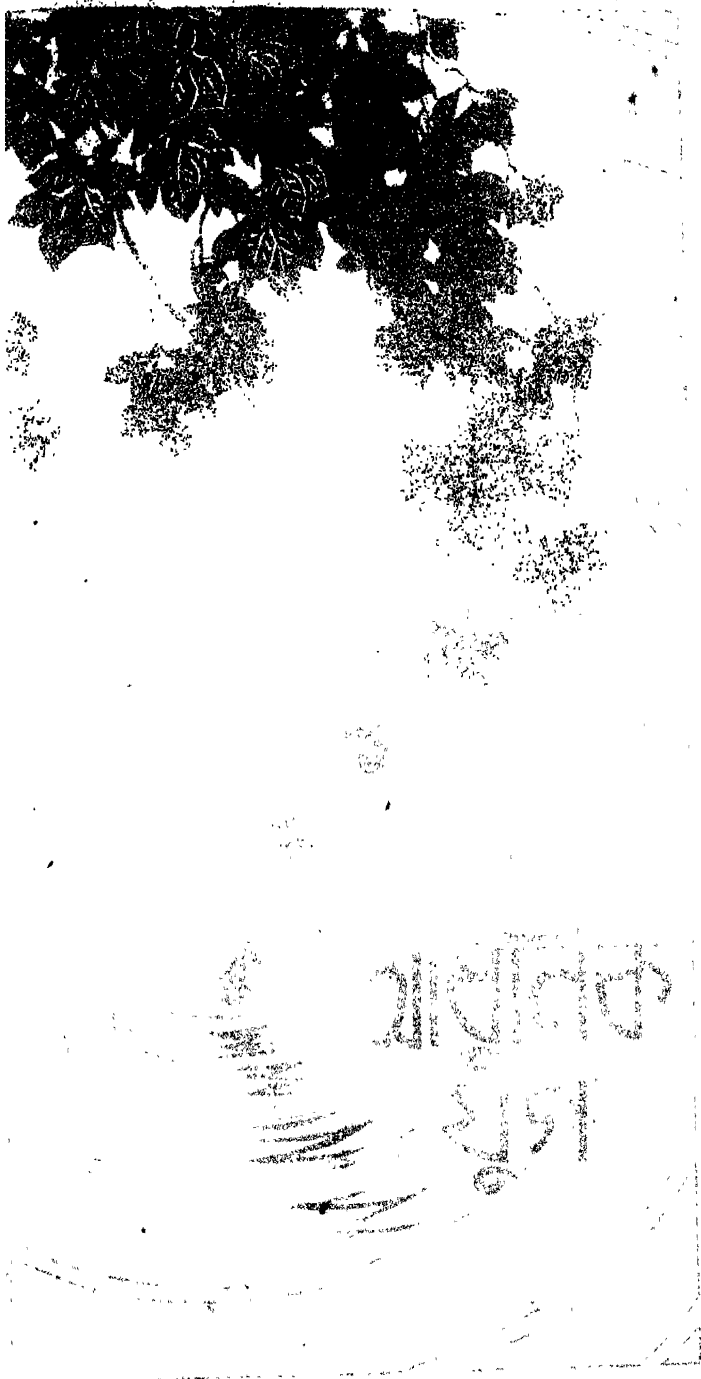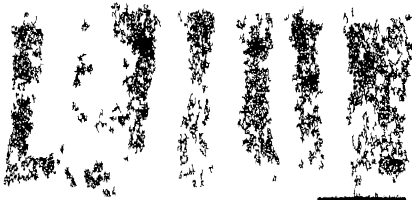
বসন্তে

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল,
চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে,
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।
সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল
আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুল-কল-
মঙ্গলধ্বনি।
চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, সজনি।
সখি রে,—
এ যৌবন-ধনে দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দুর-বিন্দু,
হইবে চন্দন-বিন্দু,
দেখিব লো, দশ ইন্দু
সুনখ গগনে।
চির-প্রেম-বর মাগি লব, ওলো ললনে !
সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল,
চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে,
চল লো জুড়াব আঁখি, দেখি শ্রীমধুসূদনে!

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বৃথা

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পরিবে কভু ফুল হার
ব্রজ-কামিনী?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?
হায় লো দোলাবি, সখি কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া?
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গি পিকবর
গেছে উড়িয়া!

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রেম-পত্রিকা*

এস, গুণনিধি,
দেখ আসি',—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়-মনঃ-প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি' রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে,
নহে, কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি', উদাসিনী-বেশে
সাজি', পূজি, উদাসীন, পাদপদ্ম তব!
রতন-কাঁচলী খুলি', ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন, ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ, ভুলি' রত্নরাজি,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি, হে, কবরী,
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
প্রেম-মন্ত্র দিয়ো কর্ণমূলে!—
প্রেমাধীনা নারীকূলে ডরে কি হে, দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশী, কুল-মান-ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?—বিরলে লিখিয়া

এই প্রেম-পত্রিকাখানি মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্য হইতে গৃহীত। ইহা লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখার প্রেম-পত্রিকা। মধুসূদন তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্যে"র রাক্ষস-রাক্ষসীকে যেমন ভীষণ নরখাদক জীবরূপে অঙ্কিত করেন নাই, তেমনি বীরাঙ্গনা কাব্যের সূর্পনখাও ভীষণা নহে। এখানে সে অসামান্যা সুন্দরীরূপে কল্পিত। অনুপমা সুন্দরীর বেশে উপস্থিত হইয়া সে লক্ষ্মণের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে। চিত্রটির যেটুকু অংশে সার্বজনীন আবেদন ফুটিয়া আছে—যেটুকু অংশে সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রণয়িণীর প্রণয়-লোলুপতা প্রকাশিত, শুধু সেইটুকু অংশই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লেখন রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা, নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে, ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি! ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জা-ভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর,—হায়, সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—
কি আর কহিব তার? যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ, থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি'!
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা।
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও নৃমণি,—
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে!
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে, বসিব সেখানে
মুদিত-কুমুদী-রূপে আজি সায়ংকালে,
তুষিও দাসীরে আসি' শশধর-বেশে!
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে,
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি,—
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি', হে স্বজনে!

আইস মলয়-রূপে, গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি।

আইস ভ্রমর-রূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি' বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয়, ভ্রমর—দেব, আসি' সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি !—

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে, আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে ? আসি ত্বরা করি',
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্মৃতি

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার !
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর !

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

নারী

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায়,
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পবন সুবাস বায়।
নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে পরিমল প্রেমের ধারা,
তারকা-খচিত উজল-গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা!
আননে লোচনে কপোলে অধরে,
সে হৃদি কানন কুসুম রাশি
আপনা আপনি আসি' থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।
অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায়,
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায়!
অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন মন নয়ন-লোভা!
তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো করে আছে আলয় যার,
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার?

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

পুনর্মিলন

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো, কভু আমি তোমা ছাড়া নয়,—
অলক্ষ্যে চরিব সদা নিকটে তোমার,
তব ভাবী বিঘ্ন যাহা,
আমি যদি জানি তাহা,
আগেতে সঙ্কেতে দিব সমাচার তার।
উপস্থিত বিপদে সাধিব প্রতীকার।
কালের নিষ্ঠুর ক্রিয়া ভুলিয়া যখন,
অবশ নিদ্রায় তুমি ভুঞ্জিবে স্বপন,
তুমি আমি সেই যেন পূর্ব্বের সংসার—
সেই পূর্ব আলাপন,
সেই প্রেমময় মন,—
অলীক ভেবো না হেন মিলনে আত্মার।
আমি কি ভুলিতে পারি প্রণয় তোমায়?
হে প্রিয়ে অন্তরে তুমি হইও না নিরাশ,
পায় না প্রেমীর প্রেম কখন বিনাশ!
কাম, লোভ, কোপ, হেয় বৃত্তি সমুদয়
এরা চিরস্থায়ী নয়;
দেখ তার পরিচয়,
উদয় হইয়া পুন তারা লোপ পায়,—
চিরবৃদ্ধিশীল প্রেম পাই পরীক্ষায়।
প্রেম যদি রয়, রবে অবশ্য ভাজন,
আছে ক্ষুধা, নাই অন্ন—না হয় এমন।
দুজনার প্রেমের ভাজন দুইজন,

যে ভাবে থাকিব যথা
থাকিব ত্বজনে তথা,
বিশেষ বিশ্বাস ইথে ধরে মম মন,
আশা ছাড়া প্রেম হায়। রহে কতক্ষণ।

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভুলিলে কেমনে

ভুলিলে কেমনে ?
এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ?
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী-কূলে,
বলেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে ?
যথা ওই গিরিবর
চলিতেছে নিরন্তর
সরসী-হৃদয়ে বারি—ভুলিলে কেমনে ?
তেমতি হৃদয়ে মম,
ওই বারিধারা সম,
ঢালিলে যে প্রেমধারা প্রেম-প্রস্রবণে,
সেই প্রেম-প্রবাহিণী
আজি কূলবিপ্লাবিনী,
প্লাবিয়া হৃদয়-সর বহিছে নয়নে,

ওই স্রোতস্বতী মত
বহিতেছে অবিরত
অশ্রুধারা অবিরল প্রণয়-প্লাবনে।
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,
পড়ি' এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কূলে,
বনের কুসুম-কলি শুকাইবে বনে!
ভুলিলে কেমনে?
এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে?

—নবীনচন্দ্র সেন

দাও দাও একটি চুম্বন

দাও দাও একটি চুম্বন
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা,
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন।
আকুল ব্যাকুল হয়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব অর্পণ।
দাও দাও একটি চুম্বন।

পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির-পরশে,
লাজ রক্ত শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।

তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও লও, আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া।
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডুষে শুষিয়া।

দাও দাও একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে, সাগর সঙ্গমে,
দুর্জয় বাণের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।
দাও দাও একটি চুম্বন।

আর এক,—একটি চুম্বন।
তোমার ও ওষ্ঠ দুটি বাসন্তী যামিনী জাগি',
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি ?
দাও দাও একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর,
চক্ষু বুজি, মাথা গুঁজি করিবে শয়ন।

দাও সখি, মদির চুম্বন।
দাও দাও একটি চুম্বন।
পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী সনে
মগ্ন মধু কুহরণে,
থাকে যথা, সেইরূপ পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ, মম ওষ্ঠ, উঠুক কুহরি।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে।
চারিধারে গুরুজন, চল অন্তরালে,
দোঁহার হৃদয় মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে—
'আন থালা, ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়?'
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে, গুমরে,
মনোদুঃখে, ঘোমটায় জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে।
ছাদে চল, মুক্ত বায়ু, অদূরে তটিনী,—
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

আঁখির মিলন

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল শুধু শত আলাপন।
হ'ল মন জানাজানি, হল প্রাণ টানাটানি,
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন।

বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন—
ওই আঁখির মিলন।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

বিরহ-সঙ্গীত

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল!
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা—'বাসি ভাল,' 'বাসি ভাল'!
যে দিকে, যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আলো!
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি' উঠি, নিশি বা পোহায়ে গেল!

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

ক্ষতি নাই

শরতের সুবিমল পূর্ণিমার শশী,
জনমের মত যদি চির অস্ত যায়,
বলনা আমার তাহে ক্ষতি কি প্রেয়সী ?
শত চন্দ্র হতে তব মুখ শোভা পায় !

শরতে বসন্তে মম নাহি প্রয়োজন,
যৌবনকুসুমে তব কুসুমিত কায়,
হিমপাতে চিরনষ্ট হৌক পদ্মবন,
তোমারি অধর আছে ভরিয়া সুধায় !

হয় হৌক মেঘশূন্য আষাঢ়-আকাশ,
আছে নব মেঘে ছেয়ে তোমার কুন্তল,
নীলনেত্রে নীলসিন্ধু ক্ষিপ্ত বার মাস,
তুচ্ছ সে সাগরশোভা, তুচ্ছ নীল জল !

যদি এ বিশাল বিশ্ব হয় ভস্ম ছাই,
তুমিই আমার আছ, কিছু ক্ষতি নাই !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

আহ্বান

হের প্রিয়া, এই ধরা তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি নদী সাগর শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে,
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— লয়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে,
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ বারতা!
আছে দেহ, আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু,—চাহি অমরতা।

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহবণ,
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন?

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে প্রিয়া?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মার অনুভব।

প্রেম-গীতিকা

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান।
কত জন্ম মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ মর্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান।

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস প্রিয়া।
শত শত ভগ্ন-স্তূপ— কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম জন্ম আশা স্মৃতি নিয়া।

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালেব গরিমা।
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয় লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা।

আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এস, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমের সস্নিগ্ধ করুণায়।—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা অক্ষমতা,
জড়ায়ে ছড়ায়ে আপনায়।

লয়ে প্রেম সুধারাশি এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া।
এস, সুখ-দুঃখ-দূরে • জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চূরে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপিয়া।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

অধরে অধরে

এমন চাঁদিনী নিশি   পুলক কম্পিত দিশি
এমনি বিজন উপবনে,
মুখেতে চাঁদের আলো   দীপ্ত আঁখি তারা কালো
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।
কুঞ্চিত অলক চুল   ঈষৎ দোদুল দুল
অঞ্চলে বকুল ফুলরাশ,
আধো গাঁথা মালাখানি   হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ।
তুলিয়া কুসুম হার,   সঁপিলাম করে তার
অনন্ত খুলিল আঁখি 'পরে,
মুহূর্তে বন্ধন চূর্ণ   অপূর্ণ হইল পূর্ণ
স্পর্শ হ'ল অধরে অধরে।

—স্বর্ণকুমারী দেবী

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার;
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

প্রেম-গীতিকা

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনা ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের, সকল কবির গীতি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোজাসুজি

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে!
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে,
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশী লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

বাসন্তী রং বসনখানি
নেশার মত চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মত বক্ষে পড়ে!
একটু দেওয়া, একটু রাখা,
একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু সরম,
দু'জনের এই বোঝাবুঝি!
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

মধুমাসের মিলনমাঝে
মহান্ কোন রহস্য নেই,
অসীম কোন অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই!

আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

তাহার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত!
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে কেউ যোঝাযুঝি!
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইক তাহার কোন দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা,
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলি-ঘুঁজি!
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় !
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় !

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার ;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব !

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু-কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস !
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ !
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে বহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে,
ভাগ্যের গায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরু-পথ-তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।

ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি' মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী হোক্ মহীয়সী
তুমি আছ আমি আছি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়ের প্রতীক্ষা

মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে,
প্রিয়তম, তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর-ব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ,
তুমি এসে ভালবাসিবে।
মম মর্ম্মমুকুরে দূর হ'তে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন-কায়া!
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি'
তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি'
কবে তুমি আসি' অধর পরশি'
মুখপানে চেয়ে হাসিবে!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উদ্বোধন

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর,
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর !
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোনো সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে !

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি ?
মর্ম্মর প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু,—সেকি তুমি ?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উদ্ভাসে
বিকশিত হয়েছিল 'কুমারী' বয়ানে ?

কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময় কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি!

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে
আসনি আজি সে বেশ পরি';—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয়;
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম,
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি'

আরো;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি,
কিন্তু যেন চক্ষুদুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ যেন মোর প্রাণে।
তখন নক্ষত্রসম ছিলে দূরস্থায়ী!
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

কিন্তু আজি যৌবনসোদ্যম,
প্রভাতশিশির-
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাসসম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মত,—
সে দৃঢ়নির্ভবপ্রেমে মোবই পানে নত !

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দব ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্ববে,
যদি অপ্সরাব সম্মিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশ-নীলাম্ববে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুব
হইত , অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশে অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কাব ,
হইত আশ্চর্য্য তাহা ,
কিন্তু হইত না অর্ধমধুব-সংগীত তার,
যেমতি মধুব
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম' ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল বায়

জীবন-পথে

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন্ ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে?—
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে
তোমার সর্বস্ব! শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু, দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে;
এ জলে তোমার তৃষ্ণা করো পরিহার
সমূলে সংহার করো মোর লাজ ভয়;
অচেনা এদেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয় গেহে। কি কহিব আর,
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার ঠাঁই।

দূর হতে যবে মোরে ভালবাসা দিতে
বলেছি সহস্রবার,—করিনা প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি; কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা। কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়
কে বলিতে পারে? কিন্তু কালে পায় ক্ষয়
কঠিন পর্ব্বত-দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে

দুঃস্বপ্ন-পীড়িত চিত্ত, কি বেদনা ভরে
উঠিলাম ; বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার,
সম্মুখে দেখিনু তোমা ; হাত রাখি হাতে
পুছিনু—এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে ?

কহিলে—তোমারি তরে এসেছি আবার
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা, ঠেলি অন্ধকার
জাগে যথা উষা নিত্য। দেখ চারিধার
কি আলোক, কি সঙ্গীত ; দেখ কি সুন্দর
জীবন-তরঙ্গ-রঙ্গ ! দুঃস্বপ্ন-কাতর
কে রহে দিবসে, ঢাকি আঁখি আপনার ?
এই শুভ্র দিবালোকে চল দুজনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ,
প্রেমের আনন্দ গীত, কর্ম কোলাহল
সুখের দুঃখের স্রোত কত বহি' যায়
পাশাপাশি। চল যাই ধরি' প্রেমপথ
দুজনে লভিয়া প্রাণে দুজনার বল।

কহিনু—সার্থক হোক্, তোমার প্রণয় !
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও,
আমাতে যা আছে যদি তাই শুধু চাও,
তোমার অতৃপ্তি মোর অপুণ্য না হয়—
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পারো তাও
কর গো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্ তব জয়।

বহুভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে!
কেবল নিজের ভার দুর্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোর। যদি অশ্রু বহে,
ঢাকে আঁখি, করস্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপ-স্পর্শে দীপ যথা জাগে।

—কামিনী রায়

আবাহন

অমনি এস গো তুমি হৃদয় নন্দনে
বিগলিত নীলাম্বরে স্নানার্দ্র বসনে।
নাহি কোন লাজ হেথা নাহি কোন ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়।
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ বাহিরের বসন-ভূষায়।
বাহুপাশে বাঁধা রবে কনক-বন্ধনে
দুটি প্রাণ দুজনার মন আলিঙ্গনে।
বহিয়া আসিবে ওই বক্ষস্থল হতে
আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণ স্রোতে
এই বক্ষ মাঝে, এই হৃদয়ের 'পরে,
উচ্ছ্বসি উঠিবে হিয়া নবরাগ ভরে।
এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবন্ধনে,
লাজ ভয় ত্যজ আসি মর্ম-নিকেতনে।

— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি যে আমার সকল জগৎজোড়া

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইনু সারা।
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?
যখন কথাটি কহিতে শুনেও শুনিনি কানে,
যখন গানটি গাহিতে,—চাহিনি তোমার পানে,
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভাণে,
যতনের অযতনে পড়িনু কি শেষে ধরা ?
দেখিতাম যবে স্বপনে —সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত কুসুমে সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়নতারা ?
চাহি নাহি তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে।
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে,
তব মূর্তি করিনি পূজা, স্মৃতিই রয়েছে জড়ায়ে—
কেমনে জানিলে—তুমি যে আমার সকল জগৎ জোড়া।

—অতুলপ্রসাদ সেন

নিদ্ নাহি আঁখি পাতে

বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী—আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন-পিয়াসে
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে—
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলন সম্ভাষে,
আমারো যে সাধ, বরষার রাতে কাটাই নাথের সাথে।
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।
গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া
এস হে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন্ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ,
এখনো মোরে তেয়াগিয়া ?
এ জীবন-ভার হয়েছে অসহ, সঁপিব তোমার হাতে।
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।

—অতুলপ্রসাদ সেন

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি ! সেই দিন বসন্ত প্রভাতে
মন-প্রাণ-অন্ধ-করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর পরশিলে মন !
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ !—
ভালো করে দেখে নাই, করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা।
আর সেই, সেই দিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এমন !—
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে ! জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে ! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি' পুষ্প-অর্ঘ্য দান !
সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য অশেষ !
রহস্য-মধুর হাসি ! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র ! প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গছায়া স্বরগের পথ
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ !

তারপর গেছে দিবা, গেছে নিশা কত।
গিয়াছে স্বপন-প্রায় আশা শত শত—
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চলগন্ধ সুরভি সমীব,
এ মোর পরাণ 'পরে! সুখে দুঃখে শোকে,
পবিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পুর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন!
হে মোর প্রভাত পুষ্প, হে অপরিচিতা!
হে আমার যৌবনেব পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন-চঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা!
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণি!
হে আমার যৌবনেব স্বপন-সঙ্গিণি!
হে আমার আপনাব! হে আমার পর!
হে আমার বাহিবেব! হে মোর অন্তর—
হে আমার—হে আমার চির মর্মময়!
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়!
আছিলে গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, মোর এ পঞ্জব জুড়ে!
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে, দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে,—
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প, মস্তকে গগন!—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন!

—চিত্তরঞ্জন দাশ

ঘোমটা খোলা

ঘোমটা গিয়াছে সরে, এত লাজ তায়,
মু'খানি দেখাতে বালা এতই নারাজ।
বায়ু, দেখ, অপ্রতিভ মুখপানে চায়,—
বিস্ময় বিহ্বলভাবে করেছি কি কাজ!
বিশ্বের সৌন্দর্য হ্রদ মথিয়া মথিয়া
তুলিল এ রূপরাশি কোন্ জাদুকর?
ছুটিছে সলিলরাশি দুকূল প্লাবিয়া,
বহিছে শোভার স্রোতে রূপের নির্ঝর।
কোন্ দোল পূর্ণিমার আবীরে, আ মরি!
আনন মণ্ডিত হল লোহিতে লোহিতে?
কোন্ বাসন্তীর স্পর্শ-পুলকে শিহরি'
ফুটিল আশোক পুষ্প গুচ্ছে আচম্বিতে?
বৃথা ও ঘোমটা টানা—বসন-সীমায়
এ রূপ ফোয়ারা কভু রুদ্ধ রাখা যায়?

—সুরেন্দ্রনাথ সেন

লীলার ছল

আমি যদি চাই, অবগুণ্ঠনে
তুমি মুখখানি ঢাক,
নয়ন ফিরালে, তবে অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক !
এমনি করিয়া চিরদিন কিগো !
জড়ায়ে রাখিবে মোরে ?
তবু কাছাকাছি হবে না, আমার
জীবন দিবে না ভরে ?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে সরে থাক !
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন্ স্বপন আঁক !
পূজা চাও তুমি হৃদয় প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী !
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি' !
ফাগুন ফুরায়, ফুল ঝরে যায়
ওগো কৌতুক রাখ,
হৃদয়ের পুরে পরিচিত সুরে
ডাক গো বারেক ডাক।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন করে কতদিন আর কাট্‌বে কে তা জানে!
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমেষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যেখান্‌টিতে বস্‌ত সেজন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে,
দেখ্‌ছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে,—
বেশী আমি পাইনি যে গো, পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি, একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাস্‌ছি মনে করে,
দেখ্‌তে হঠাৎ ইচ্ছে হয়ে চক্ষু এল ভরে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভরে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হয়ে, উদাস হয়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চলে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখ্‌তে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী, প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি ! সাধনার ধন !
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির আকিঞ্চন !
করুণ-লোচনা
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা !
মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জ্যোছনার মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই !
অয়ি ইন্দু-লেখা !
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে
ফিরি নাক' দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
হে অমৃত-ধারা !
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হয়ে গেছে সারা।

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি দশদিক মন্দার-সৌরভে
আমি মুগ্ধচিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমার ইঙ্গিতে !

আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ ? হায় কে তা জানে !

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিঃশ্বাস—
আনিলে চেতনা,
দুঃখের বিহ্বল সুখ, সুখের বেদনা!
ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙ্গে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে!

আজি মোর সর্বচিত্ত সারা তনু ভরি'
আনন্দ অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি'।
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি আনন্দিতে!

জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তাতিথি শেষে
মানসী দিয়েছো দেখা মানুষের দেশে
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি।

তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি!
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া!

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি'!
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মাথা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমার নিঃশ্বাস !
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্যমণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালো চুল খুলে
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে
সন্ধ্যা সরোবরে ;
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে সরে।

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে,
আজ একেবারে
মর্তে এলে মূর্তি ধরে আমারি দুয়ারে !

মুগ্ধ মোরে করেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি,—
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !
শিশু যেন করে সাধ
নিত্য সে সুন্দর চাঁদ
মিটে নাক' বাসনা তাহার
তুমি থাক তেমতি আমার

তব লাগি উথলিয়া
নিয়ত উঠুক হিয়া,—
চিরদিন শ্রান্তি ক্লান্তি হীন,
চাহিনেক' মিলন দু'দিন !

আধফোটা পদ্মফুল
বৃন্ত'পরে ঢুলু ঢুল্—
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার,
তুমি থাক তেমতি আমার !

আমি তোমা ঘিরে ঘিরে
বেড়াইব চির ঘুরে
মধুর গুঞ্জনে ভরি' দিব চারিধার
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !

—তুমি মোর হয়ো না পাবার,
তাহে নিতি নব সুর
উঠিবেনা সুমধুর
বাজিবেনা সারঙ্ আমার!

বেড়ি বেড়ি বিবর্ত্তন
ঘোরে যথা গ্রহগণ
ঘুরুক সহস্র সাধ তব চারিধার,—
তুমি মোর হয়ো না পাবার!

তৃপ্তির সঙ্কীর্ণ কূপে
মিলনের কাষ্ঠ যূপে
কে পারে তোমারে ফেলে করিতে সংহার,
এমন হৃদয়হীন হৃদি আছে কার?
তুমি মোর হয়োনা পাবার!

সঙ্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে
তোমার কি বাস সাজে?
অতৃপ্তি অনন্ত-ভূমি রাজত্ব তোমার:
দূরে থেকে প্রদানিব কর অনিবার;—
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার!

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

পেয়েছি

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়,
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে
দুখেরে করি জয়।
আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ-বাসে।

আসে গো সুখ, দুঃখ দলি'
চাহিনে আমি তারে;
বিকাশে নব প্রীতির কলি
সুরভি মধ্য-ভারে।

এ দেহ-প্রাণ, তোমার কাছে
দিয়াছি সঁপে আমি,
আমার গানে জড়ায়ে আছে
তোমার সুর স্বামী!
এপারে কভু পাব না আমি!
যেদিন মম সাঁঝে—
ওপারে যাব, জীবন স্বামী!
উদিবে হৃদিমাঝে।

দোঁহের প্রীতি-অভিজ্ঞানে
চিনিব দোঁহে ত্বরা,
তৃপ্ত মোরা হইব, পানে
অমৃত চিত-ভরা!

—অনঙ্গমোহিনী দেবী

বিকাশ

ওহে সুন্দর মম অন্তরে
একি উচ্ছ্বাস নব,
একি আকুল পুলক হিল্লোল প্রিয়
নব সঙ্গীত রব !

আজি মধুময় ধরা শোভা-সৌরভে ভরা
নিভৃত আমার কুঞ্জ-কুটীরে
আজি কি মহোৎসব !

বিকশিত আজি নব গৌরবে
হৃদয় কমল মম,
তাই উচ্ছ্বসি যেন উঠিছে প্রাণের
লাবণ্য নিরুপম।

নবীন ভাবনা কত ফুটে উঠে অবিরত
চেয়ে আছে তব প্রেমালোক তরে
সূর্যমুখীর সম।

কতদিন হায় জেগেছো রজনী
কতনা বিষাদভরে,
তবু পারনি বুঝিতে মোরে কতশত
ব্যগ্র প্রশ্ন ক'রে !

কত নব ভালবাসা আবেগ-পূর্ণ ভাষা
লজ্জা কাতরা বালিকার কাছে
বিফলে গিয়াছে মরে।

আজি ফেলে দিব তুচ্ছ জীর্ণ
হীন লাজ আচরণ,
তুমি এস, হৃদয়েশ, হৃদি মন্দিরে
হৃদি-মন্থন ধন!

গোপন মরম মম দেখ অন্তরতম!
দেখ, কোন্ পদে স*পিয়াছি আমি
তরুণ জীবন মন!

মৌন মূঢ় সে বালিকা চিত্তে
দেখ, কি মত্ত আশা!
আজি মিটাতে চাহে সে প্রেমতৃষা তব
ঢালি চির ভালবাসা!

চাহে সে পরাণ খুলে কহিতে শ্রবণ-মূলে
যুগে যুগে যত প্রণয়িনীগণ
কহিয়াছে প্রেমভাষা!

ওহে বাঞ্ছিত! দেখ, আজি মোর
একি ব্যাকুলতা নব!
চাহে ক্ষুদ্র হৃদয় পুরাইতে তব
আশা আকাঙ্ক্ষা সব!

রেখেছি বক্ষ ভ'রে সান্ত্বনা তব তরে,
ওগো অতৃপ্ত আছে এ হৃদয়ে
সর্ব তৃপ্তি তব।

—রমণীমোহন ঘোষ

গীতলক্ষ্মী

প্রেম, তুমি জন্মে জন্মে সঙ্গ নিলে মোর
সঙ্গীতের বেশে,
জন্মান্তর-স্মৃতি তাই ফুটিছে বাঁশীতে
নিমেষে নিমেষে।

তুমিও ছাড়নি মোরে, আমিও ছাড়িনি,
প্রেমেরি এ ধারা !
দুজনে বেড়াই নেচে দুঃখের জগতে
মদে মাতোয়ারা।

তরঙ্গিত ধ্বনি-সিন্ধু তোলে তল হ'তে
রমার মূরতি ;
বেজে উঠে ভাব-রাজ্যে দেউলে দেউলে
মঙ্গল আরতি ;

তুমি আর আমি করি কি যে সুধা পান,
কেহ নাহি জানে ;
আশে পাশে এ সংসারে ধূ ধূ চিতা জ্বলে
ভাবের শ্মশানে !

সৃজন-প্রত্যূষে বিশ্ব কেবলি আঁধারে
করিতো কি বাস ?
বাঁশী নাই, হাসি নাই, ছিল বক্ষে ধরি'
চির সর্ব্বনাশ !

কবে তুমি প্রীতি-লক্ষ্মী, এলে পুষ্পরথে
আলোকি' ভূতল ;
হাসিল উদ্ভিদ-রাজ্য ! ভাসিল সরিতে
শত শতদল ;

ভৃঙ্গ-বঁধু গুঞ্জরিয়া ভৃঙ্গবধূ পদে
সঁপিল পরাণ ;
স্তব বাঁধি কোকিলারে উতলা কোকিল
করিল আহ্বান ;

ছেয়ে গেল ছন্দ-গীত দেখিতে দেখিতে
বিশ্ব-চরাচরে ;
জাগি' ছন্দহীন কবি অনাদৃত বাঁশী
তুলি' নিল করে।

সেই মহোৎসবে মাতি' সদ্যসিক্ত প্রাণে
তরুণ উচ্ছ্বাসে
শূন্য মন্দিরের দ্বার তূর্ণ মুক্ত করি
ছিনু কার আশে !

সে যে তুমি, হে জাগ্রত প্রণয় দেবতা,
এলে মোর ঘরে
বিকাশি' এ হৃদিপদ্ম তব সুকুমার
পাদপদ্ম-ভরে !

সাধকের সুধা-স্বপ্নে জন্ম নিলা বুঝি
প্রীতির আধার ;
করুণা কোমল আঁখি, ওষ্ঠে সদা হাসি,
কণ্ঠে গীতিধার !

কবে জেনেছিলে মোর অজ্ঞাত-বেদনা
তব লাগি, প্রিয়া !
তাই মধু-মূর্তি ধরি' পশিলে সেদিন
পূর্ণ করি' হিয়া।

প্রথম মিলন-মোহে ছিনু যবে দোঁহে
মৌন, মুগ্ধ, মূক,
ছিল কাছে কৌতূহলী অদৃশ্য প্রকৃতি
বুঝি জাগরুক !

সে লিখিল বসি' বসি' মোদের কাহিনী
সহস্র রূপকে ;
বনে বনে ফুলে ফুলে গগনে গগনে
মেঘের স্তবকে।

রচিনু আমার ছন্দে সে মধু-মিলন ;—
মনে পড়ে বালা ?
সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে শেষে গলে
তব কণ্ঠমালা !

চক্ষু ভরি' এল নেশা ; কণ্ঠ ভরি' তৃষা,
বক্ষ ভরি তাপ ;
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরিয়া উঠিল
প্রেমের প্রলাপ !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

পরিচয়

দেখেছি তোমায় কোন্ মাধবী পার্বণে
প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সৌন্দর্যের সার।
এসেছিলে ধরে রূপ প্রতিমা উষার,
গন্ধর্বশালায় কিম্বা আলেখ্য ভবনে॥
মেঘাচ্ছন্ন কোন্ দূর অতীত শ্রাবণে
এসেছিলে কাছে কিম্বা, করি অভিসার
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার
গগন সীমান্তে কোন বিস্মৃত ভুবনে!
তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব পরিচয়,—
মন কিন্তু যুগ-স্মৃতি করেনা সঞ্চয়॥
ভাসিয়া চলেছি দোঁহে হাতে হাত ধরে,
ছাড়াছাড়ি হবে কিগো, পাব যবে কূল?
অথবা মিলন হ'লে জীবনের পরে,
চিনিতে আবার হবে পরস্পরে ভুল?

—প্রমথ চৌধুরী

খেলা

প্রেম যদি খেলা হ'ত ভালো হত তবে,
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্তে নীরবে
শুধু কল্পনার সুখে! দূরে গেলে তুমি,
সংসার হ'তনা মনে শূন্য মরুভূমি,
ব্যাকুল হ'তনা প্রাণ সদা আশঙ্কায়,
সমান মধুর হত মিলন বিদায়!

প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
দুদণ্ড কাঁপায়ে যেত মোর পুষ্পবন,
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হাসি দিয়ে গেল কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস!
কম্পমান ক্ষণিকের মর্ম্মর গাথায়
সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায়।

—প্রিয়ম্বদা দেবী

ঋতু-সম্ভার

যেদিন আমারে বাঁধ তব বাহু-পাশে
বুকে এসে লাগে তব বুকের স্পন্দন,
সুদীর্ঘ সঘন তব গভীর নিঃশ্বাসে
কপালে লেপিয়া যায় মধুর চন্দন।
কোমল ও হৃদয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে
আমার হৃদয়ে উঠে রক্তের তুফান,
অধীরতা জেগে উঠে চঞ্চল পবনে
বিস্ময়ে আকাশ চাহে সুনীল-নয়ান।
কখন মুদিয়া আসে নয়ন-পল্লব
কখন এ তনু হয় আবেশে বিহ্বল,
তোমার হৃদয়-তটে হৃদয়বল্লভ,
মূরছিয়া পড়ে মোর রক্ত-শতদল।
চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ।

—নিরুপমা দেবী

পূর্বস্মৃতি

আজকে সখি, পড়চে মনে সেই অতীতের সন্ধ্যাবেলা,
বসতে যখন কাছটি ঘেঁসে কঠিন হ'ত গল্প বলা,
নীলাম্বরীর আঁচল নিয়ে খেল্‌ত বায়ু লীলার ছলে,
মন ভোলানো মন্ত্রে তোমার মনটি কখন পড়্‌ত গ'লে,
আকাশ ভ'রে উঠ্‌ত তারা, ফুট্‌ত হাসি চাঁদের মুখে,
হাতের ভিতর হাতটি ধরা, কতই কথা মনের সুখে।
সন্ধ্যা-তারা অবাক হ'য়ে মুখের 'পরে থাক্‌ত চেয়ে,
ফুলের মত মনটি তোমার আমার প্রাণে রইত ছেয়ে!
লেখাপড়ার পুঁথির মতন পড়েছিলে আমার এ মন,
সৃষ্টিহারা দৃষ্টি তোমার, স্পর্শ তোমার অমূল রতন,
স্বপ্নপুরীর কল্পলোকে উড়িয়ে দিতেম ভাবের পাখা,
বিশ্ব ছিল সবুজ তখন, আকাশ ছিল সোনায় আঁকা!
মাঝখানেতে উঠ্‌ল যে ঝড় ঘূর্ণী-বাতাস মাথায় ঘিরে,
তলিয়ে দিলে কোন্‌ অতলে মানস-সরের পদ্মিনীরে!
রঙ্গভূমির দৃশ্য পরে নাম্‌ল কালের যবনিকা ;
ঘূর্ণী বায়ুর আঘাত পেয়ে নিভ্‌ল মনের দীপ্ত শিখা!
অতীত এখন শুধুই অতীত, নাই সে মনের উদ্দীপনা—
বুকের তালে নূপুর তোমার শোণিত-স্রোতে যায় যে চেনা!
মিথ্যা সখি, জাগানো আজ অতীত দিনের অতীত কথা,
হয়ত তাতে পাবেনা সুখ, হয়ত মনে পাবেই ব্যথা!

—ইন্দিরা দেবী

অপূর্ণ মিলন

হঠাৎ যেতে ঘোম্‌টা-ফাঁকে
একটুখানি চাওয়া—
সেই ত আমার সুখের সাগর,
স্বর্গ সে ত পাওয়া।
থমকে গিয়ে পথের মাঝে
একটুখানি হাসি—
সেই ত আমার চাঁদের আলো,
সেই ত মধুরাশি।
কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে
একটি ছুটি কথা—
সেই ত আমার সোহাগ আদর
জুড়িয়ে জ্বালা-ব্যথা।
আধেক ভয়ে আধেক লাজে
একটি চুমো খাওয়া—
সেই ত আমার শূন্যবুকে
মন্দাকিনী-পাওয়া!

—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সার্থকতা

হৃদয়ের আরো কাছে এস এস প্রিয়
পরিতৃপ্ত কর প্রাণ ও অঙ্গ পরশে,
তৃষাতুরা যাচে ওই অধর-অমিয়—
দুটি ভুজপাশে মোরে বাঁধো ভালবেসে !

রেখোনাকো ব্যবধান ও সীমান্ত রেখা ;
কেন এ লুকায়ে থাকা ? কেন আর ছল ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ও মাধুরী লেখা,
কেন গো মলিন তবু হৃদি-শতদল ?

বাসনা-বিহ্বল-প্রাণ, পিপাসা কাতর
অলক্ষ্যে আসিতে চায় এ হৃদয়ে ছুটি
দু'টি চিত্ত মিশি' হোক্ সুধা-সরোবর
মিলনের ফুলদল থাক্ সেথা ফুটি' !

এস প্রিয় ! এস মোর মানস-মন্দিরে
দাও দাও, ধরা দাও এ ভুজ-বন্ধনে !
কেন করো, ব্যর্থ-আশ তব সঙ্গীনীরে,
সার্থক হউক তার কামনা ক্রন্দনে !

এস প্রিয় ! এস সেই পরিচিত সাজে,
চির সম্মিলিত হই এস দুজনায়,
গভীর অতল এই মিলনের মাঝে
মিলিয়া মিশিয়া যাক এ দু'টি হিয়ায় !

—রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শেষ-বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগ-ভরে ;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে-দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণপরা
দু'খানি করে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি
শেষ-বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবনে সাথী ;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল,
রূপের ডালি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল
'বাসর' রাতি।

মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি'
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা বিদায়-সজল
আঁখির পাতে ;

সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল আমারে—
তোরণমঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল তোড়ী—
গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা
কোমলে কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে
দাঁড়ালে এসে—
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আল্‌তায়
বধূর বেশে ;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে
'বরণ' করে।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝল্‌মল্ দু'টি পান্নার 'দুল'
কর্ণমূলে।
বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা
প্রেম-নর্মদা, পূত-নির্মলা—
ভাঙি' সরমের মর্মর-গিরি
তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া বেলার গন্ধ-বিলাসী
মন্দ বায়!

মনে পড়ে সেই নব-যৌবন-
গরবী-গ্রীবা—
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি-
বিজুলী বিভা—
তখন তরুণী ছিলে না বুকের,
ছিলে না মরমী দুখের-সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূযুগ
নিন্দি' 'রতি',
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতিঃ!

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে' যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসি,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি পারিজাত
মেখলা প'রে।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকন
সমুখে মম,
চাবির 'রিং'টি বাজায়ে আসিতে
ক্ষণিকা সম;

হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে ;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখোচোখি দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল মাঝে।

হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেমনি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রংটি ফলান
মেঘের কোলে।
খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয় চতুর্দোলায়
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ ভূষায়
সেজেছে সবে।

আজি পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি'
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝিনি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যা' ছিল তা স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি
শেষ-বাসরে।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্রা

চঞ্চল হিয়া, বল বল প্রিয়া,
বল বল প্রিয়তমা,
মনো-মধুপের মোহন রূপের
সুধা-শতদল সমা !
কোন্ অলকার কামনা-দুয়ার খুলি'
মৃণাল-গরবী সলিল-শয়ন ভুলি'
ফুটিলে আমার বক্ষ-সরসে তুলি'
প্রেমারুণ অনুরাগে !
ওগো মনোরমা, ঊষা প্রিয়তমা
এত মোরে ভালো লাগে !

সেদিন গোধূলি, আঁখি-পাতা তুলি'
হাসিমুখে সুবিমলে,
চেয়েছিলে দুটি ডাগর নয়নে
মুগ্ধ-মরম-তলে।
যেদিন প্রথম-পরিচয়-ক্ষণে
শুধু পলকের মৃদু দরশনে
জীবনের রথ টানিলে চরণে
অলখ হৃদয়-হারে,
নিমেষে চমকি', স'পিলাম সখি
নিঃশেষে আপনারে।

তোমার বুকের চীনাংশুকের
রজতাঞ্চল-রুচি
কৌমুদী-ছলে নিল কি ধরার
সকল ম্লানিমা মুছি ?

দ্রাক্ষা-অধর চুমায় তোমার
বকুল বালিকা বিভল হিয়ার
খুলিল কি ধীরে মৃদু দল তার
কিশোরী-বয়স লভি' ?—
তোমার বুকের আলিঙ্গনের
বহিয়া বিনোদ ছবি।
প্রেয়সীর বেশে, নিলে ভালবেসে
আমারে বরণ করি' ;
নয়নের ডোরে বাঁধিলে যে মোরে
হে হৃদয়-ঈশ্বরী !
চরণ সেবার নিয়েছি যে ভার,
জানি, নহি আমি যোগ্য তাহার
সোনা করি' দিলে মোর সংসার
হে পরশমণি তুমি।
স্নেহের আমার গোমুখী-প্রপাত,
প্রেমের তীর্থভূমি !

কে তোমারে প্রিয়া, রাখিল সৃজিয়া
সোহাগে আমারি তরে !
কোন্ মনোরথে আসিলে লক্ষ্মী
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে !
কোন্ সে অতীত পুণ্যের ফলে
রচিলে আলয় পরাণ-কমলে
তব উৎসব-দীপ আজি জ্বলে
আনন্দে দিবাযামী,
কোন্ 'শিব'-জটা বহি' বল্লভী
মানসে আসিলে নামি'।

দুলিয়া ফুলিয়া প্লাবন-জাগর
মিলন-সাগর, সখি,
লুটায়ে পড়িছে বক্ষ-বেলায়
তোমারি কিরণে ওকি ?
তোমারি পেলব পীযূষ-তৃষায়
চিত্ত-চকোর ফিরে কি নিশায়
চাহি ছায়াপথে তোমারি দিশায়
অধর-কুমুদ জাগে ?
তোমারি জীবনে জীবন তাহার
দাবী তার সব আগে।

যাচিয়া চরণ, হৃদয় আসন
পেতেছিনু তব প্রিয়া
ধন্য করিলে অঙ্ক তাহার
শ্রীপদ-প্রসাদ দিয়া।
থাকো থাকো সেথা হইয়া অচল
নিখিল-নারীর হে রাকা-অমল
তোমারি ধ্যানের মন্ত্রে কেবল
ফুটুক্ আমার বাণী ;
তুমি থাকো মোর সকলের বাড়া,
তুমি থাক মোর রাণী।

—গিরিজাকুমার বসু

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া !
তোমার বন্দনা করি।

হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী !
তোমারে বন্দনা করি।

নাম নাহি জানা, ওগো আজো নাহি আসা !
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালবাসা
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী !
সৃষ্টি-দিন হতে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি'—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা ! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে।
স্বপনে পাইয়া তোমা, স্বপনে হারাই বারে বারে।
অরূপা লো ! রতি হয়ে এলে মনে,
সতী হয়ে এলেনাক ঘরে।
প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে
বধূ হয়ে এলে না অধরে !
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে !—

"উতারো নেকাব"—
হাঁকে মোর দুরন্ত-কামনা !
সুদূরিকা ! দূরে থাক--ভালবাস—নিকটে আস না।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।—
জন্মজন্মান্তর ধরি' লোক-লোকান্তরে তোমা করেছি আরতি,
বারেবারে একই জন্ম শতবার করি' !
যেখানে দেখেছি রূপ,—করেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি'।
রূপে রূপে অপরূপা, খুঁজেছি তোমায় !
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায় !
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি'
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয়া মনোরমা !
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।
ব্যথা-দেওয়া বাণী মোর, এলে নাক কথা-কওয়া হয়ে !

চির-দূরে-থাকা ওগো চির নাহি-আসা !
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে !
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে !
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,

জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা !
যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি !—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে !
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে !
প্রকাশ গোপন !

যে কেহ প্রিয়ারে তাব চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙ্গা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে
সকলের সাথে আমি চুম্বিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা !
তরু লতা পশু পাখী সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে আমি রমি বিশ্ব কামনাতে !
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি ;
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি !
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি,
তরুণ-তরুণী-বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি !
কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই !
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই ?
বৃথাই বসিনু ভালো ?   বৃথা সবে ভালবাসে মোরে ?

তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সেই যায় সরে !
কেন হেন হয় হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালবাসিলাম, তার চেয়ে ভাল কেহ
বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু !
আমারি বধূর বুকে হাস তুমি হয়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী !
বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে, এ সে নহে !
কুহেলিকা ! কোথা তুমি ? দেখা পাব কবে ?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ—কিম্বা জন্ম লবে ?
কথা কও, কথা কও প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া !

কহিবে না কথা তুমি ! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে।
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা !

প্রেম-গীতিকা

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন!
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়,
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন।
বৃথা আমি খুঁজে মরি' জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপ, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভাল—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু!
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

—কাজী নজরুল ইসলাম

বধূ-বরণ

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধূলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।
শুধু শোভাময়ী ছিলে এত দিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়-গোধূলি-লগনে।
ঊষার ললাট সিন্দুর-টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে।

প্রভাতের ঊষা, কুমারী সেজেছ
সন্ধ্যায় বধূ-উষসী,
চন্দন টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বেদাগ মু'শশী।
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি'।
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা
আজ হলে বধূ রূপসী॥

দোলা চঞ্চল ছিল এই গেহ
তব লটপট বেণী-ঘায়,
তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ঐ উর-হার-মণিকায়!

এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে
সেথা গৃহ-দীপ জ্বেলো এ আলোকে,
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে—
আজি এ মিলন মোহনায়
ও ঘরের হাসি বাঁশির বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়।

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বল নারী—"এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!"
—কাজী নজরুল ইসলাম

'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ কথা কও!
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকরনার এতই কি কাজ
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ কথা কও!

কথা কও, নারী কথা কও !
কত কল্পের কবি-কল্পিত—
কাহিনীর ভার কেন বও ?
লজ্জা জড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে ;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
মনে মনে হেসে সারা হও !
কেন ইঙ্গিত ? সুখে ও দুঃখে,
কি তার অর্থ ? কথা কও—
নারী কথা কও।

কথা কও, গোপী কথা কও !
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির বও ?
গাছে গাছে ঐ কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে !
তব শ্যামে ধরা শ্যাম হ'য়ে উঠে—
সুন্দরী তারে চিনে' লও !
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায়, কথা কও—
রাই কথা কও !

কথা কও, দেবী কথা কও !
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী, পাষাণই কভু নও।
কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘষে' নিজ কায় ;

[ু]পে দীপ কত দহে' জ্বলে' যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও।
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
[ম]ুখ ফুটে সেই কথা কও,—
দেবী, কথা কও!

কথা কও, সতী কথা কও!
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় বলে
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরাময় তোমা দিল ছড়াইয়ে;
খুঁজে ফিরে আজ মহা উন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও!
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী, কথা কও!

কথা কও, বউ কথা কও।
বিশ্ব-মর্ম-অন্তঃপুরিকা,
গুণ্ঠন আজি তুলে লও।
ভোগী ভাবে, ওই, কবি সাধে গানে;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে;
যুগ-যুগান্ত ফুকারিব কত?
চির মৌন ত তুমি নও!
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ কথা কও!'

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পরম-ক্ষণ

তোমার সাথে একটি রাতে
বদল হ'ল মিলন-মালা—
একটি প্রহর সুখের লহর,
একটি নিমেষ সুধায় ঢালা!
তোমার খোঁপার পাপড়ি চাঁপার
ঝরল আমার শিথান 'পরে,
টুটল শরম, রূপটি পরম
ফুটল তখন ক্ষণেক তরে!
বাহুর শাখা—পরীর পাখা!—
বুকের পরশ সব ভোলায়!
আলস-রসে আবেশ-বশে
চাউনি দোলে চোখ-দোলায়!
কালো ফুলের গন্ধ-চুলের—
উথলে ওঠে নিশাস-বশে,
ঠোঁটের ঠোঙায় চুমায় চুমায়
চুমুক দিলাম হাসির রসে!
তোমার সাথে মিলন-রাতে
সেই পরিচয় নিবিড়তম!
ক্ষণেক লাগি' দুজন জাগি
গৌরী-হর মূর্তি সম।
দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ;
আত্মা দেহ ভিন্ন কেহ
নয় যে কভু—এক সমান!

তাইত তোমায় দেহের সীমায়
ধরতে পারি আলিঙ্গনে—
দুইয়ের ক্ষুধা একের সুধা
কেবল ত সেই পরম ক্ষণে!
সকল প্রাণে পুলক বানে
স্বর্গ আসে ধরায় নামি'
একটি বোঁটায় ফুল সে ফোটায়
তোমার তুমি, আমার আমি।

—মোহিতলাল মজুমদার

শ্রাবণ-শর্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে—
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার বার শিথার-শয়ন!
প্রদীপের তলে বসি' যূথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথ তারে চিকনিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন!

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্বরী
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর!
কত রাধা বায়ুরবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর!—
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হবে এই মিলন মধুর।

—মোহিতলাল মজুমদার

মুগ্ধ-আবাহন

ওগো, মহুয়াবনের সাকী,
অধর-শুক্তি ভরি' আনো সুধা, বকুল-পরাগ মাখি'
গণ্ড-পিয়ালা ঢলে শোণিমায়
দ্রাক্ষা-সুরায় ভরি' আনো তায়,
অঙুরের পানি কাঁখে আনো ছানি' কনক-কলসে ঢাকি'
ওগো মহুয়াবনেব সাকী !
মূরছি চরণে পড়ুক হৃদয়,
পিয়ে পিয়ে আজি মোহাবেশময়,
নেয়ে নেয়ে তব রূপ-সরোবরে ডুবে যাক তুটি আঁখি ;
ওগো মহুয়াবনের সাকী !

ওগো, পাষাণ-দেশের রাণি,
আনো ও বাহুর অটল অটুট পাষাণ-নিগড়খানি।
পাষাণি, পাষাণ বক্ষ-কারায়,
বন্দী যেন গো আপনা হারায়, না শুনে মুক্তি-বাণী।
ওগো পাষাণ-দেশের রাণি !
বীরবালা, আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিনু কবচ-কৃপাণ
বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে, চির-পরাজয় মানি'
ওগো, পাষাণ-দেশের রাণি !

ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া,
এস গো উজল আঁখির ভুরুর অঞ্জন-লতা নিয়া।
দিগন্ত ভরা শৈল বনানী,
জলদ-কুহেলি কাল 'দীঘি ছানি'
নিচোলে চিকুরে উজল কাজল রাখিয়াছ সঞ্চিয়া।

ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া
নীল অম্বরে ডুবে যাক্ পাখী,
ঢাকি' দাও আঁখি অঞ্জন আঁকি,
স্বপন দেখাও, যাত্নকরি ! মায়া-অনুরঞ্জন দিয়া ;
ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া ।

ওগো, স্বপনদেশের পরী,—
এস রঞ্জিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি' ।
তারার কুসুম ছড়াতে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে এসগো ধরাতে
সোনার প্রদীপে জোনাকি-ফিন্‌কি প'ড়ে যাক্ ঝরি' ঝরি',
ওগো, স্বপন-দেশের পরী !
প্রজাপতি-রচা তুইটি ক্ষেপণী
জ্যোছনার স্রোতে ছুটে হে আপনি,
সে তুটি পাখায় ঢাকিয়া আমায়, সংজ্ঞা লহ গো হরি',
ওগো, স্বপনদেশের পরী ।

—কালিদাস রায়

নদী ও নারী

নদী বুকে নেমে আছো সারা সন্ধ্যাবেলা,
চম্পক আঙুলে জলে চলিতেছে খেলা
স্বচ্ছন্দ কৌতুকে কভু তার মাঝখানে
দ্রুত সঞ্চালিত-কর বজ্রবাণ হানে
শত ইন্দ্রধনু দিয়া ভরি' নভতল,
মুখের ফুৎকারে কভু ছুঁড়ে দাও জল ;

কখনো বা নব-নীল-ঘনবাস দিয়া
গৌর-কান্ত-তনুখানি ঘসিয়া মাজিয়া
তারি পানে চেয়ে থাকো নির্নিমেষ আঁখি
আপনারে যত দেখো দেখা থাকে বাকি।
এলায়িত সদ্য-সিক্ত কেশপাশ ঘিরে',
অন্ধকার মেঘচ্ছায়া নেমে আসে ধীরে।
তোমারে চিনেছে নদী তাই নাচে সুখে,
তুমি তারে চিনিয়াছ তাই বাঁধা বুকে।

*　　*　　*
*　　*　　*
*　　*　　*

নদী নীরে নামো যবে গাহন করিতে
কেন হই নাই নদী তাই ভাবি চিতে!
মেলে দিয়ে যৌবনের শতদল-দলে,
নিঃসঙ্কোচে নেমে যেতে আমার অতলে
লজ্জাহীনরূপে লীন গরবী রূপসী।
নীবি-বন্ধ হ'তে ধীরে বস্ত্র যেত খসি'
অলস আবেশে। লীলায়িত তনুখানি
মত্তস্রোত মোহ-ভরে বক্ষে নিত টানি'।
দুটি রক্ত-অধরের চুম্বনের রেখা
তরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে যেত লেখা।
বসনের মতো করি সারা দেহটির
চারিপাশে ঘিরিতাম গাঢ় নীল নীর।
একেবারে অন্তরের মাঝখান হ'তে
স্রোত আসি মিলে যেতো ও রূপের স্রোতে।

—হেমেন্দ্রলাল রায়

সম্বল

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভরি'
অনন্তের হাসি তাই অশ্রুযূথী রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি'।
ক্রন্দন,—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলক-নীর নেত্রতীরে করে টলমল।
বেদনা হয়েছে সোনা—দুঃখ হল পরম নির্মল
বক্ষে তারে ধরি'।
জীবন-অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি
দীর্ঘপথ বাকী,
হে মোর পরম রম্য! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি'
চলেছি একাকী।
জানি জানি, জানি বন্ধু! দিকহারা এ পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি বনপথ-'পরে
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম সমাদরে
গৃহে লবে ডাকি'।

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়
ফুটায়েছে ফুল;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়ঃ
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব মাধুর্য-মধু সিঞ্চিয়াছ প্রাণে প্রাণে মোর;
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর,

বেজেছে আলোর বাঁশি, ছিন্ন করি' ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি' প্রাণ-কূল!

আমার বসন্ত ওগো।—জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে
মুঞ্জরি, তুলেছো তুমি হিম-শীর্ণ বিশুষ্ক বনানী,
—দক্ষিণার বেশে।
আনন্দ পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি, কলকণ্ঠী কপোতীর মত,
—নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত,
অপার্থিব হেসে।

আমার এ রিক্ত-প্রাণে পরম-পূর্ণতা বন্ধু, তাই
আমি সর্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছ ভালো,—আর কোন দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী!
তুমি বাসিয়াছ ভালো, তুমি ভালোবাসিয়াছ বঁধু,—
যত স্মরি তত প্রাণে উছলি উথলি উঠে মধু,
বিরহ বেদনা তাই গন্ধ-ধূপে পরিণত,—শুধু
ঊর্ধ্ব-অভিমুখী!

—রাধারাণী দেবী